আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রী অনাথনাথ বসু

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই, ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৫৩, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
চৈত্র ১৩৬৭

মূল্য এক টাকা

রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

সূচী

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা	২
নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত	৭
কোম্পানির আমল : প্রথম যুগ	১২
উডের ডেসপ্যাচ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার	১৬
১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন	২১
কার্জনী আমল ও স্বদেশী যুগ	২৭
গোখলের বিল ও ১৯১২ সালের শিক্ষানীতি	৩৩
বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের আরম্ভ	৩৯
স্যাডলার কমিশন	৪২
প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা	৪৯
মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা	৫৬
ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা ও বুনিয়াদ শিক্ষাপদ্ধতি	৬৩
সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা	৭৪
আমাদের সমস্যা	৭০
উপসংহার	৮৪

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমেই সংক্ষেপে ইহার ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান রূপ ও সমস্যাগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে।

আজ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলিতেছে ইহার সূত্রপাত হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাহার মূলে ছিল কয়েকজন ভারতীয় ও বিদেশী এবং বিশেষ করিয়া কতকগুলি ইউরোপীয় মিশনারীর উৎসাহ ও চেষ্টা। তাঁহাদের চেষ্টার ফলেই এদেশে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার গোড়া-পত্তন হইয়াছিল। একদল বিদেশীর ধারণা বুঝি বা পশ্চিমদেশ হইতে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড হইতে, এদেশে প্রথম জ্ঞানের আলোক আসে এবং বিদেশীদের চেষ্টাতেই বুঝি আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হয়। তাঁহারা জানেন না যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ; রাজ্যবিপ্লবে সে ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও কোনোদিনই তাহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বরং আমাদের দেশের কেহ কেহ মনে করেন যে আগেকার দিনের তুলনায় ইংরেজ আমলে এ পর্যন্ত শিক্ষার প্রসার হওয়া দূরে থাক, উলটাই হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই আমলে এখনও পর্যন্ত দেশে নিরক্ষরতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এক বক্তৃতায় গান্ধীজী এই মর্মে অভিযোগ করেন। সুপরিচিত ইংরেজ শিক্ষাবিদ্‌ সার ফিলিপ হার্টগ ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরেরও প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত এখনও এ বিষয়ে কোনো নিষ্পত্তি হয় নাই।

সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা

ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখনও আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ঠিকমত চলিতেছিল ; এমন-কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে যখন নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হইল তখনও সেই সুপ্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যায় নাই ; তখনও দেশের সর্বত্র বহু টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, মক্তব-মাদ্রাসা ছিল ; তখনও গ্রামে গ্রামে গুরু-মহাশয়গণ পাঠশালায় দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন, টোলে অধ্যাপকগণ শাস্ত্রচর্চায় রত ছিলেন।

টোল ও মক্তবগুলি তখন ছিল এদেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র, আর পাঠশালাগুলি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র।

সেকালের পাঠশালাগুলির ব্যবস্থা ছিল খুব সাদাসিধে ধরণের। সকল পাঠশালারই যে নিজস্ব গৃহ ছিল তাহা নহে ; অনেক ক্ষেত্রেই কোনো সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে বা বারোয়ারীতলার পূজামণ্ডপে পাঠশালা বসিত ; যেখানে নিদেনপক্ষে তাহাও জুটিত না সেখানে গুরুমহাশয় গাছতলায় আশ্রয় লইতেন ; আম্রবটের ছায়ায় গ্রাম্য পাঠশালা বসিত, ছেলেরা পাততাড়ি-বগলে সেখানে আসিয়া জুটিত, এবং গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে তাহাদের বিদ্যা বিতরণ করিতেন।

পাঠশালার কাজ শুরু হইবার কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না, গুরুমহাশয়ের সুবিধামত পাঠশালা বসিত, পাঠশালার ছুটি হইত। গ্রাম্য উৎসবে পূজাপার্বণে পাঠশালা বন্ধ থাকিত ; এখনকার মত সাপ্তাহিক বা বাৎসরিক নির্দিষ্ট কোনো ছুটির ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া অনধ্যায়ের ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল এটা মনে করিবার কারণ নাই।

পাঠশালার পাঠ্য ছিল সংকীর্ণ ; সামান্য লেখাপড়া ও জমাখরচের হিসাব, পাঠ্য বলিতে এইটুকুই ছিল। তাহাতে না ছিল ইতিহাস ভূগোল,

না ছিল ধর্মশিক্ষা স্বাস্থ্যতত্ত্ব, হাতের কাজ বা ব্যায়াম। ছেলে চার-পাঁচ বছর পাঠশালায় কাটাইয়া কোনোমতে রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে, চিঠিটা-পত্রটা লিখিতে, দলিল-দস্তাবেজ তৈয়ারি করিতে ও জমিদারী-মহাজনী হিসাবটা রাখিতে শিখিলেই তাহার পাঠশালার শিক্ষা শেষ হইত। তখনও ছাপা পুস্তকের চল হয় নাই; সুতরাং পাঠশালায় সেগুলির ব্যবহার ছিল না।

পাঠশালায় হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেই পড়িত; এবং সাধারণত মধ্যবিত্ত বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি তাহাদের ছেলেরাই লেখাপড়া শিখিতে যাইত। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা জমিদারী সেরেস্তায় বা মহাজনের গদিতে মুহুরীগিরি করিত। এই হিসাবে পাঠশালার শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আমলের একটা বিবরণে দেখিতে পাই, পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছাত্রের সংখ্যা বেশি হইলেও তাহাদের মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছাত্রও যে এক-আধ জন দেখা যাইত না এমন নহে; এমন-কি হাড়ি বাগদি মুচি বাউরি জেলে মাল কলু কামার প্রভৃতি জাতির ছাত্রের সন্ধানও এই বিবরণে আমরা পাই। মেয়েরা সাধারণত পাঠশালায় যাইত না; তাহারা যেটুকু লেখাপড়া শিখিত, সেটুকু বাড়িতেই শিখিত। তবে এক-আধ জন মেয়ে যে পাঠশালায় পড়িত না তাহা নহে; কিন্তু সে খুব অল্প বয়সে। একটু বড় হইলেই তাহাদের গৃহকর্মের শিক্ষা আরম্ভ হইত, তাহার মধ্যে আর পাঠশালায় যাইবার অবসর থাকিত না।

দেশের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোল মক্তব মাদ্রাসাগুলি। দেশের স্থানে স্থানে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবদ্বীপ মিথিলা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানগুলি ছিল সংস্কৃত শিক্ষার বড় বড় কেন্দ্র। সে সকল স্থানে বহু টোল

ছিল ; দূর দূর দেশ হইতে ছাত্রেরা আসিয়া সেখানে লেখাপড়া করিত। পাটনা মুর্শিদাবাদ দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আরবী-ফারসীর চর্চা ছিল, মক্তব-মাদ্রাসা ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে টোলে কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি পড়িত। সকলেই যে যাজন বা অধ্যাপনা করিবার জন্য পড়িত তাহা নহে। অনেকে জ্ঞানলাভের আগ্রহে বিদ্যাচর্চা করিত। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ছেলেরা ঘরে আখনজী রাখিয়া ফারসী শিখিত, কোরান পড়িতে শিখিত ; তাহাদের মধ্যে যাহারা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে চাহিত তাহাদের মক্তব-মাদ্রাসায় গিয়া ভরতি হইতে হইত। সেগুলিও ঠিক ছিল টোলগুলির মত। সেখানে ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিত, এমন-কি তাহাদের থাকিবার খাইবার খরচ পর্যন্ত লাগিত না। ফারসী ছিল তখনকার রাজভাষা ; তাই বহু হিন্দুসন্তানও ফারসী শিখিত রাজসরকারে চাকরির জন্য। কেহ কেহ আবার শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই আরবী-ফারসী পড়িত। ইহাই ছিল তখনকার দিনে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা।

একটা কথা মনে রাখিবার মত, তখন উচ্চশিক্ষা অবৈতনিক ছিল। টোল মক্তব মাদ্রাসাগুলি রাজসরকারের বা ধনীদের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইত। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ব্রহ্মোত্তর ভোগ করিতেন, পূজা-পার্বণে বৃত্তি ও বিদায়ী পাইতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের কুটিরে বসিয়া বিদ্যাদান ও শাস্ত্রচর্চায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহারা বিদ্যা বিক্রয়ের কথা ভাবিতেও পারিতেন না।

টোলে বেতনের ব্যবস্থা না থাকিলেও পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য বেতন লাগিত। তবে সেখানে বেতন নির্দিষ্ট ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে যাহার যাহা সাধ্য সে তাহাই দিত। কেহ হয়তো কিছু চাল দিল, কেহ বা তৈল দিল ; আবার যে দিতে পারিত সে পয়সাই দিত। হিসাব

করিয়া দেখা গিয়াছে, তখনকার দিনের পাঠশালার গুরুমহাশয়দের আর্থিক অবস্থা আজকালকার তুলনায় বেশ সচ্ছলই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একটা হিসাবে দেখিতে পাই তখন পাঠশালার একজন গুরুমহাশয় গড়ে মাসে নগদ প্রায় পাঁচ-ছয় টাকা উপার্জন করিতেন। এক শ বছর আগে পাঁচ-ছয় টাকা আয়ে ঘরে দুর্গাপূজা করা যাইত। তাহার উপর লাউটা কুমড়াটা, পূজাপার্বণে বিদায়ী, উৎসবে একখানা ধুতি বা গামছা এগুলি তো ছিলই। সুতরাং এখনকার তুলনায় তখনকার গুরুমহাশয় ভালোই পাইতেন বলা যাইতে পারে।

আধুনিক কালের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে হয়তো তখনকার দিনের পাঠশালার এই শিক্ষা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে হইবে না; কিন্তু সে যুগের সমাজব্যবস্থা ও প্রয়োজনের তুলনায় সে শিক্ষা যে অকিঞ্চিৎকর ছিল তাহা বলা চলে না। সে যুগের একজন অভিজ্ঞ দর্শক তাঁহার নিজের দেশ স্কটল্যাণ্ডের পাঠশালাগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া আমাদের দেশের এই গ্রাম্য পাঠশালাগুলিকে ভালো বলিয়াছেন এবং পাঠশালার গুরুমহাশয়দের কাজের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথমত আজ যেমন আমরা প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ, শিক্ষার এই ধরণের কয়েকটি ভাগ করি আগেকার দিনে তেমন করা হইত না। আজকালকার হিসাবে তখন শিক্ষার প্রাথমিক ও উচ্চ মাত্র এই দুইটি স্তরই ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা বলিতে তখন কিছুই ছিল না।

এই শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আর-একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাইতে পারে। তখন প্রায়-গ্রামেই পাঠশালা ছিল, কারণ পাঠশালা গ্রাম্যদেবতার মতই তখনকার পল্লীসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। প্রতি গ্রামেই অবশ্য টোল অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু সাধারণত প্রাথমিক

শিক্ষার জন্য গ্রামের ছেলেদের গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত না। বড় বড় গ্রামে পাঁচ-ছয়টি পর্যন্ত পাঠশালা থাকিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সরকারের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে তখন শুধু এই বাংলা দেশেই (তখন বিহার ও ছোটনাগপুর এবং কটক জেলাও বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) এক লক্ষ পাঠশালা ছিল।

কিন্তু সে সময়টা ছিল প্রাচীন, সকলপ্রকার ব্যবস্থার পড়তির সময় ; রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অর্থনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষাব্যবস্থাও ধীরে ধীরে শক্তিহীন, প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল। বহু প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং যাইতেছিল। দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যই ছিল তাহার প্রধান কারণ। ১৮২২ সালে মাদ্রাজের এক কালেক্টার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসের কারণস্বরূপ নির্দেশ করিয়াছিলেন, দেশের সর্বত্র সৈন্যদের চলাচল, বিদেশী বস্ত্রশিল্পের প্রসার ও প্রাচীন কুটীরশিল্পগুলির ধ্বংস। প্রাচীন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে কত গ্রাম্য পাঠশালা যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব আর কেহ রাখে নাই। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় কিনা সন্দেহ। তখনকার তথ্যের হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার যতখানি প্রসার ছিল মনে করা যাইতে পারে বস্তুত শিক্ষার প্রসার তাহার চেয়ে যে অনেক বেশি ছিল তাহা অনুমান করিলে বিশেষ অন্যায় করা হইবে না।

এই তো গেল প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা। এমন সময়ে ইউরোপীয় মিশনারী ও অন্য কয়েকজনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এক শিক্ষা-ব্যবস্থার পত্তন এদেশে হইল। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এক দিকে

যেমন এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনি প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটিতে লাগিল।

নূতন ব্যবস্থার সূত্রপাত

পূর্বেই বলিয়াছি মিশনারীগণই এদেশে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের আগমনের সঙ্গেই এদেশে মিশনারীগণের পদার্পণ ঘটে। পর্তুগীজ বণিকদের আগমনের কিছু কাল পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ এদেশে আসেন। তাঁহারা ভারতের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রে ধর্ম প্রচারের সহিত তাঁহাদের স্বদেশীয় আদর্শে গঠিত কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পর্তুগীজদের পতনের পর সেই বিদ্যালয়গুলিও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। এই রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণের মধ্যে জেস্থইট সম্প্রদায়ের সেণ্ট জেভিয়ারের নাম এখনও এদেশের কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত রহিয়াছে।

পর্তুগীজদের পরে দিনেমারগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসে। দিনেমারদের সময়েই প্রটেস্টাণ্ট মিশনারীরা প্রথম এদেশে আসেন। এই সকল মিশনারীদের বড় কর্মকেন্দ্র ছিল পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজের আশেপাশে। তাঁহারাই এদেশে প্রথম ইংরেজী শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের কিছুকাল পরেই ইংরেজ মিশনারীরা এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। প্রথম আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলেই তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মাদ্রাজের এক ব্রিটিশ মিশনারী স্থানীয় মিশন ইস্কুলে 'সর্দার পোড়ো' ব্যবস্থা আবিষ্কার করিয়া তাহা নিজেদের দেশে প্রবর্তন করিয়া বিখ্যাত হন। মাদ্রাজের পর ধীরে ধীরে বাংলা দেশে মিশনারীদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত উইলিয়ম কেরী কয়েকজন সহকর্মীসহ বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসেন।

মিশনারীরা যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই মুদ্রাযন্ত্র লইয়া গিয়াছেন, স্থানীয় ভাষা শিখিয়াছেন, সেই ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থ ছাপিয়াছেন, খ্রীস্টের বাণী প্রচার করিয়াছেন, দেশের ধর্ম ও সমাজ -ব্যবস্থার নিন্দা করিয়াছেন, যাহারা তাঁহাদের প্রলোভনে, প্ররোচনায় বা শিক্ষায় স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীস্টান হইয়াছে তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিদ্যালয় করিয়াছেন। কোথাও বিদ্যালয় আগে হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া ধর্মপ্রচারের চেষ্টা পরে হইয়াছে; কোথাও বা প্রচারকেন্দ্র আগে হইয়াছে পরে বিদ্যালয় হইয়াছে! এইভাবে ইংরেজ আমলের প্রথমভাগে মিশনারীদের চেষ্টায় এদেশে এক নূতন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল।

মিশনারীরা যে ইস্কুলগুলি প্রতিষ্ঠা করেন দেশের প্রাচীন পাঠশালাগুলি হইতে সেগুলি অনেকটা স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। প্রথমত সেখানে খ্রীস্টানধর্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত; বস্তুত সেই শিক্ষা দেওয়াই ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়ত সেখানে ইতিহাস ভূগোল ব্যাকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়গুলি পড়ানো হইত। আর সেখানকার কাজকর্মের ব্যবস্থাও অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট ছিল; রবিবার দিন পাঠশালার ছুটি থাকিত। তাহা ছাড়া মিশনারীরাই এদেশে প্রথমে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক লেখেন ও ছাপেন। মিশনারী ইস্কুলগুলিতে সেই পুস্তক ব্যবহার করা হইত। আর-একটি ব্যাপারেও তাঁহাদের বিশেষত্ব ছিল; প্রাচীনকালের পাঠশালায় বা টোলে একজন গুরুমহাশয়ই পড়াইতেন; নবীন ধরণের মিশনারী ইস্কুলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক গুরু শিখাইতেন। তাহা ছাড়া পুরাতন

পাঠশালায় ছাত্রদের মধ্যে কোনো শ্রেণীবিভাগ ছিল না, নূতন ধরণের পাঠশালায় ক্রমে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে মিশনারীদের ইস্কুলগুলিতে এক নূতন ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হইল।

ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে বিদেশী বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গোলমাল হইয়া গিয়াছে; ফলে সমাজদেহেও নানাপ্রকারের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে; ১৭৫৭ সালের পলাশীর রণ-প্রাঙ্গণে আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লইয়া দেশের অর্থ নৈতিক জীবন আপনার করায়ত্ত করিয়াছে। ধীরে ধীরে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে; কোম্পানি ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব করা শুরু করিয়াছে। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন ইংরেজের রাজ্যবিস্তার দ্রুত চলিয়াছে এবং একটির পর একটি করিয়া দেশী রাজ্যগুলি ছলে বলে ব্রিটিশরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে।

ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কোম্পানির ছিল না। বরং পাছে রাজ্যবিস্তারে বাধা ঘটে এই ভয়ে তখন কোম্পানি-রাজ দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হাত দিতে অনিচ্ছুক; এমন-কি মিশনারীদের প্রতি তাহাদের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে; এককালে কোম্পানি যতদূর সম্ভব মিশনারীদের আনুকূল্য করিয়াছিল, কিন্তু রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই সন্ধিক্ষণে পাছে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের ফলে এই ধর্মপ্রাণ দেশের লোক উত্তেজিত হইয়া রাজ্যবিস্তারে বাধা ঘটায় এইজন্য কোম্পানি মিশনারীদের শাসন করিয়া দিয়াছে। যখন ১৭৯৯ সালে উইলিয়ম কেরী বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য আসিলেন তখন তাঁহাকে কোম্পানির মুলুক ছাড়িয়া শ্রীরামপুরে দিনেমারদের আশ্রয় লইতে হইল। শুধু তাহাই নহে, ইতিমধ্যে কোম্পানির একজন বড় কর্মচারী ওয়ারেন হেস্টিংস সম্ভো-

রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমানদের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ দেখাইবার জন্য এবং তাহাদের কয়েকটি চাকরি দিয়া খুশী করিবার জন্য ১৭৮১ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেখাদেখি ১৭৯১ সালে কাশীতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানচর্চা নহে, উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের সন্তুষ্ট করা এবং তাহাদের সন্তানদের জন্য কয়েকটা চাকরির সুবিধা করিয়া দেওয়া। তখন ইংরেজ জজদের সঙ্গে দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য জজপণ্ডিত ও মৌলবী থাকিত। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ এই কাজ পাইত এবং ইহারই লোভে সেখানে পড়িতে যাইত। পড়ার সুযোগও ছিল যথেষ্ট; অধিকাংশ ছাত্রই বৃত্তি পাইত; সুতরাং সেখানে লেখাপড়া শেখার খরচ বিশেষ ছিল না।

১৭৯৩ সালে কোম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া দিবার প্রসঙ্গে কোম্পানি এদেশের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য কোনো চেষ্টা বা অর্থব্যয় করিবে কিনা এই কথা ওঠে; বলা হয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও খরচে এদেশের লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কিছু মিশনারী ও শিক্ষক পাঠানো হউক। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবে চঞ্চল হইয়া উঠেন এবং প্রাণপণে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কেহ কেহ বলেন, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমেরিকা হাতছাড়া হইয়াছে, ভারতের লোককে আর লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই। কেহ বলিলেন, যদি আদান-প্রদানের কথা তোলা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষকে জ্ঞান দান করার চেয়ে সেখান হইতে জ্ঞান আহরণ করার চেষ্টাই বরং করা উচিত হইবে। এইভাবে কথাটা সে সময়ে চাপা পড়ে। বিশ বৎসর পরে, ১৮১৩ সালে, মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকদের চেষ্টায় পার্লামেণ্টে আবার কথাটা উঠে; ইতিমধ্যে কোম্পানির রাজত্ব অনেকটা কায়েম হইয়াছে, রাজ্য হারাইবার ভয়ও কমিয়াছে; সুতরাং

কোম্পানির কর্মকর্তাদের আপত্তি এবার আর টিকিল না ; মিশনারীদের জয় হইল। কোম্পানির সনন্দের আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ধারা বিধিবদ্ধ হইল ; তাহাতে বলা হইল, "এদেশে, প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা এবং ইউরোপীয় বিদ্যার প্রচারের জন্য কোম্পানি অন্য সকল রকমের খরচখরচা মিটাইয়া বৎসরে একলক্ষ টাকা খরচ করিবেন।" একলক্ষ টাকায় এই বিরাট দেশে একাধারে প্রাচীন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষণ এবং নবীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি কোম্পানির কর্মকর্তাদের এই ব্যাপারে আপত্তি ছিল। সুতরাং আইন হওয়া সত্ত্বেও সামান্য যে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তাহাও বিশেষ খরচ হইল না। এদিকে কিন্তু কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছে ; তিনি বর্তমান অবস্থা ও পাশ্চাত্যের সহিত স্পর্শের সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষকে এক নিমেষে মধ্যযুগ হইতে বর্তমান যুগে টানিয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। ডেভিড হেয়ার এদেশে আসিয়াছেন মানবসেবার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ; তাঁহাদের ও অন্যান্য কয়েকজনের চেষ্টায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে বাঙালীর ছেলে পাশ্চাত্য মনীষিগণের পরিচয় লাভ করিতেছে। মিশনারীদের শিক্ষাদানব্যবস্থাও প্রসার লাভ করিতেছে। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ ও ১৮২০ সালে বিশপ্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছোটদের শিক্ষার জন্য মিশনারীরা এবং হেয়ার, রামমোহন প্রভৃতি নূতন ধরণের পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন। তাঁহাদের পাঠশালায় ইংরেজী শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া অন্য অনেকেও নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আর-একদল লোকও ইতিমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী শক্তি উপলব্ধি করিয়া ফেলিয়াছে।

তাহাদের ইংরেজী শিখাইবার জন্য আর-এক ধরণের বিদ্যালয় তৈয়ারি হইয়াছে; সেখানে কোনোমতে কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়া লোকে অনায়াসে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হৌসে চাকরি পাইয়া 'বাবু' আখ্যা লাভ করিতেছে, নূতন সামাজিক পদমর্যাদা পাইতেছে। এ দিকে ইংরেজরাজত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন শাসনকর্তাদের রাজ্য হারাইবার ভয় কমিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি দিনে দিনে অধিক সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিলাত তখন বহু দূরের দেশ; সেখান হইতে লোক আনানো যেমন আয়াসসাধ্য তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং সরকারের পক্ষে স্বল্পবেতনে কর্মচারী নিয়োগের সমস্যাটাও ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

কোম্পানির আমল : প্রথম যুগ

১৮১৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে কোম্পানির কোনো নির্দিষ্ট নীতি ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু ক্রমশ একদল মুখ্যস্থানীয় কর্মচারীর অভাবে কোম্পানি প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করাই স্থির করেন। তাঁহাদের অনেকেই সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষায় নবাবিষ্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের পরিচয়লাভে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা এই ভাষাগুলি অনুশীলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নীতি গ্রহণের পক্ষে একটা বড় যুক্তি, ইহার দ্বারা এ দেশের হিন্দুমুসলমান সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর লোকদের খুশী করা যাইতে পারিবে। সুতরাং যদি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতাই করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন শাস্ত্রাদির অধ্যাপনার জন্যই অর্থব্যয় করা সমীচীন। ইহাই ছিল সে আমলের শাসনকর্তাদের মনের ভাব।

এই নীতি অনুসরণ করিয়া গবর্নমেণ্ট বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত ও আরবী ফারসী শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮২১ সালে লর্ড আমহার্স্টের আমলে

কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কথা উঠে। তখন রামমোহন তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তাহার ফলে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনে বাদীপক্ষ ছিলেন সংস্কৃত আরবী ফারসীর অনুরাগী দল; প্রথমটা তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল। প্রতিবাদীপক্ষে ছিলেন আর-একদল; তাঁহাদের মতে সরকারের পক্ষে এখন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করা সময়োপযোগী এবং সমীচীন হইবে। আরম্ভে এই দলে অল্প লোকই ছিল; কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল ততই ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এমন অবস্থায় মেকলে আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তখন বেন্টিঙ্ক এ দেশের বড়লাট, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের হর্তাকর্তাবিধাতা।

শিক্ষাসম্বন্ধে এই-যে দেশময় আন্দোলন চলিতেছিল, তাহাতে কয়েকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। ধীরে ধীরে শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লোকের, বিশেষ করিয়া মুখ্যস্থানীয় লোকদের, ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল; প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচলন করিতে হইবে, পুরাতন শাস্ত্রের কচকচি লইয়া আর দিন কাটাইলে চলিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, কোন্ ভাষার সাহায্যে এই নূতন ধরণের শিক্ষা দেশের লোককে দিতে হইবে, ইংরেজী, না, সংস্কৃত আরবী ফারসীর সাহায্যে? দেশের ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা বড় কেহ ভাবে নাই;[১] সকলেই যেন ধরিয়া লইয়াছিলেন, বাংলা হিন্দী তেলেগু তামিলের সাহায্যে এ দেশের লোককে নব্যশিক্ষায় দীক্ষিত করা যাইবে না, সুতরাং হয় ইংরেজী, না হয় সংস্কৃত আরবী ফারসীর সাহায্য লইতে হইবে।

১ বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনস্টোন মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার জন্য বলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই।

আর-একটা ব্যাপারেও বিদেশী শাসনকর্তারা এবং দেশী গণ্যমান্য লোকে অনেকখানি একমত হইয়াছিলেন ; শিক্ষা দিতে হইলে প্রথম উচ্চবর্ণকে শিক্ষা দিতে হইবে ; উচ্চবর্ণের মধ্যে নব্যশিক্ষার প্রসার হইলে কালক্রমে সে শিক্ষা সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া চুঁইয়া গিয়া অবশেষে নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। ইহাই ছিল বিখ্যাত filtration theory ; এই থিওরিতে বলে, জনসাধারণের শিক্ষার দিকে প্রথমে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই, আপাতত উচ্চবর্ণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তো হউক, তাহা হইলেই ক্রমে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে আপনা হইতেই দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হইয়া উঠিবে।

ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তখন চারিটি দল ছিল ; কিন্তু চারিটি দলেরই যুক্তি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মিশনারীরা ইংরেজী শিক্ষার সাহায্যে ধর্মপ্রচারের সুবিধা হইবে বলিয়া এই ধরণের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন নব্যশিক্ষার সাহায্যে দেশের নষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে। এই আশাতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী তৃতীয় দল ছিল কলিকাতা ও আশেপাশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ; তাহারা নিজেদের আর্থিক সুবিধার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রসার কামনা করিয়াছিল। দেশের সরকারও ধীরে ধীরে ইংরেজীর পক্ষে আসিয়া পড়িতেছিলেন, কারণ দেশের লোককে ইংরেজী শিখাইতে পারিলে সস্তা বেতনে কর্মচারী পাওয়ার সমস্যাটাও মিটিবে, আর এই ইংরেজী শিক্ষিত দেশী লোকদের সাহায্যে দেশে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধাও হইবে।

কিন্তু তখনও সরকার পুরাপুরি মনস্থির করিতে পারেন নাই। এমন সময়ে মেকলে এ দেশে আসিলেন এবং তাঁহার উপর সরকারের শিক্ষানীতি নির্ধারণ করার ভার পড়িল। এ দেশের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে

মেকলে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া বেন্টিঙ্কের সম্মুখে পেশ করিলেন; তাহাতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কুকথাই তিনি বলিলেন; বলিয়া তিনি মত দিলেন ইংরেজীর সাহায্যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারই এখন হইতে সরকারী শিক্ষানীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইবে। প্রথমে দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে; এই ইংরেজীশিক্ষিত ভারতবাসী শুধু নামে আর রঙেই ভারতবাসী হইবে, কিন্তু মনেপ্রাণে ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহারা হইবে ইংরেজ। তাহারাই দোভাষী হইয়া এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে নূতন জ্ঞান প্রচার করিবে। বেন্টিঙ্ক মেকলের মতে মত দিলেন, ভারত সরকারের শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট হইল এবং নব্যশিক্ষাব্যবস্থা সরকারী সমর্থন লাভ করিল। এইবার তাহার জয়যাত্রা শুরু হইল।

এইভাবে যখন নূতন শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন হইল তখন সরকারের সম্মুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত ছিল। তাঁহারা প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্যেই দেশে নূতন ভাবধারা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, অথবা তাহার সহিত কোনো সম্বন্ধ না রাখিয়া সম্পূর্ণ নূতন এক শিক্ষাব্যবস্থা আরম্ভ করিতে পারিতেন। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য লইলে পাঠশালাগুলির সংস্কার করিতে হইত, সেখানে নূতন ধরণের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইত। ইহাতে যেমন জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠিত তেমনই দেশের লোকের সহযোগিতা লাভ করা যাইত এবং দেশের চিরাচরিত ধারা অব্যাহত থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া উঠিত। কিন্তু তাহা হইল না। সরকার প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করিলেন এবং সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নব্যশিক্ষার সৌধ গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই এক নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হইল; সমগ্র দেশ ইংরেজী শিক্ষিত এবং ইংরেজী

অশিক্ষিত এই দুই জাতিতে বিভক্ত হইল ; আমরা 'শিক্ষিত' এই শব্দটির নূতন এক সংজ্ঞা শিখিলাম, শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত। প্রাচ্য বিদ্যায় যাঁহারা পণ্ডিত ছিলেন এতদিন যাঁহারা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এইবার তাঁহাদের আসন টলিল ; নব্য শিক্ষিতের দল তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন। ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এক দূরপ্রসারী বিপ্লবের সূচনা ঘটিল।

একটা বিষয় এইখানে দেখিতে হইবে; সুবিস্তৃত প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে অস্বীকার করায় লোকশিক্ষা প্রসারের প্রথম ও প্রধান বাধার সৃষ্টি সেদিন হইল। আজও সে বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। পরবর্তীকালে অবশ্য মাঝে মাঝে দেশের পুরাতন পাঠশালাগুলিকে নূতন শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ততদিনে সেগুলি এতই প্রাণহীন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে তখন আর সেগুলির সংস্কারের উপায় ছিল না। অথচ আজও সেগুলি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। ফলে যেগুলি এককালে লোকশিক্ষার প্রধান সহায় হইতে পারিত, আজ সেই-গুলিই তাহার সকলের চেয়ে বড় অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সুপ্রাচীন জীর্ণ পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন আজ একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উডের ডেসপ্যাচ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার

১৮৩৫ সালের পর বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতির ফলে ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার আরম্ভ হইল। প্রতি জেলায় সরকারী জিলা ইস্কুল গড়িয়া উঠিল। ১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত সরকার শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাকা জিলা ইস্কুল ও কলেজের জন্য খরচ করিলেন। ইংরেজী শিক্ষার উৎসাহে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবার মত হইল। ছেলেরা

অ আ ক খ -র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এ বি সি ডি শিখিতে লাগিল। এই নূতন শিক্ষার এত চাহিদা হইল যে প্রথম যেদিন হুগলি কলেজ খোলা হইল সেই একদিনেই ১২০০ আবেদন আসিল। দূর দূর গ্রাম হইতে কত লোক ছেলে ভরতি করিতে আসিয়া স্থানাভাবে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। চাহিদা দেখিয়া সরকারী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে বেসরকারী ইংরেজী ইস্কুল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। দলে দলে ছাত্র আসিয়া সেগুলিতে ভরতি হইল। এইভাবে আজ যাহাকে আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বলি তাহার প্রসার হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আবার নূতন শিক্ষাপ্রচেষ্টায় উৎসাহ দিবার জন্য ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিয়া দিলেন, যাহারা সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাস করিবে তাহাদের ভিতর হইতেই রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হইবে। ইহাতে দেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু এই ব্যবস্থার একটি কুফল হইল, এখন হইতে ইংরেজী শিক্ষা অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা অর্থকরী বৃত্তিশিক্ষায় পরিণত হইল। লোকে ইংরেজী শিখিতে গেল জ্ঞানের জন্য নহে, অর্থের লোভে, ভালো চাকরী পাইবার আশায়।

১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনন্দ নূতন করিয়া দিবার সময় আসিলে পার্লামেণ্টে আর একবার ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। এই আলোচনার ফলে ১৮৫৪ সালে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে বোর্ড অব ডিরেক্টরের পক্ষে সার চার্লস উড শিক্ষা সম্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ ভারত-সরকারের নিকট পাঠাইলেন। এই ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুযায়ী ভারত-সরকার তাঁহাদের শিক্ষানীতি পুনর্গঠিত করিলেন। পরবর্তী কালে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার মূলে এই উডের ডেসপ্যাচ। বস্তুত উডের ডেসপ্যাচই এ দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই ডেসপ্যাচেই এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার এবং পৃথক ভাবে শিক্ষাবিভাগ গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া উডের ডেসপ্যাচেই প্রথম এদেশের শিক্ষাসমস্যাকে সমগ্রভাবে দেখার একটা চেষ্টা হয়। ১৮৩৫ সালের পর হইতে এতদিন ইংরেজী শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো প্রকারের শিক্ষার কথা বড় একটা শোনা যায় নাই ; কিন্তু এই ডেসপ্যাচে প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মাতৃভাষা চর্চার আবশ্যকতার প্রতি ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং এই ধরণের শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় ; সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা, শিক্ষকদের শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়।

উডের ডেসপ্যাচে আর-একটি নূতন নীতির নির্দেশ ছিল। এতদিন বেসরকারী শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকে সাহায্য দেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। ডেসপ্যাচের নির্দেশের ফলে সাহায্যদান-নীতির প্রবর্তন করা হইল। এখন হইতে স্থির হইল সরকার স্থানীয় শিক্ষাবিস্তারচেষ্টাকে উপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য দিবেন ; এমন কি, ক্রমে সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিও বেসরকারী কর্মকর্তাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া শিক্ষার কাজ পুরাপুরি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই করা হইবে ; সরকার শুধু প্রয়োজনমত এবং উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্যদান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন। এই নীতির মূলে ছিল দেশের শাসন ও শিক্ষাব্যাপারে জনসাধারণের সহিত সহযোগিতার আদর্শ। বস্তুত উদারপন্থী আদর্শবাদের ভিত্তিতেই উডের ডেসপ্যাচ রচিত হইয়াছিল।

ডেসপ্যাচের ফলে বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ গঠিত হইল এবং ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন নিযুক্ত হইলেন। বাংলাদেশের প্রথম ডিরেক্টর হইলেন গর্ডন ইয়ং ; তিনি সিভিল সার্ভিসের লোক ছিলেন।

উডের ডেসপ্যাচের বড় কীর্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। দেশে উচ্চ ও মধ্য শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করিবার একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন কিছুদিন হইতেই অনুভব করা গিয়াছিল। অনেক ছেলেই আজকাল এই সকল প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী লেখাপড়া শিখিতেছিল; তাহাদের মধ্যে কাহারা ভালো, কাহারা সরকারী চাকরি পাইবার যোগ্য তাহা বাছাই করিয়া লইবার দরকার হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষার ব্যবস্থা চাই, এবং পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতার তারতম্য নির্ধারণেরও একটা মাপকাঠি চাই। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা কে করিবে? ইহার জন্য একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এই উপলক্ষ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ওঠে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয় তখন বোর্ড অব ডিরেক্টর সে প্রস্তাব নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। এইবার ঠিক হইল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা বোম্বাই ও প্রয়োজন হইলে মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাক্ষাৎভাবে অধ্যাপনার বন্দোবস্তের কথা ডেসপ্যাচে ছিল, কিন্তু সেটা গৌণ ভাবে। ফলে ১৮৫৭ সালে যখন কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইল স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়া এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর উপাধি বিতরণ করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলির দাম সেদিন যথেষ্ট ছিল; কারণ এই উপাধিগুলিই ছিল সরকারী চাকরি লাভের ছাড়পত্র বা তকমা স্বরূপ। তখনকার দিনে যে-কেহই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত তাহারই সরকারী চাকরির অভাব ঘটিত না। পরীক্ষায় পাস না করিলে চাকরি জোটা কঠিন হইত।

এইভাবে এ দেশে বর্তমান উচ্চশিক্ষার সহিত আর্থিক লাভের যোগ ঘটিয়া গেল, এবং জ্ঞান নহে, বিদ্যা নহে, অর্থের মাপকাঠি দিয়া উচ্চশিক্ষার বিচার শুরু হইল এবং লোকেও মুখ্যত জ্ঞানের জন্য নহে অর্থের লোভেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতে গেল।

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এণ্ট্রান্স এবং ১৮৫৮ সালে বি. এ. পরীক্ষা হইল। বি. এ. পরীক্ষায় সেবার ১৩ জনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ বসু, মাত্র এই দুইজন ছাত্রই পাস করিলেন। তাঁহারা উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় এণ্ট্রান্সের পর একেবারে বি. এ. দিবার ব্যবস্থা ছিল; কিছুকাল পরে এফ্. এ. অর্থাৎ ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষার প্রচলন হয়। বি. এ. তে অনার্সের ব্যবস্থাও ছিল, একজন একসঙ্গে এক বা দুই, এমন-কি তিনটি পর্যন্ত বিষয়ে অনার্স লইতে পারিতেন। অনার্স লইয়া বি. এ. পাস করার এক বৎসরের মধ্যে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়া যাইত।

উচ্চশিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজী; পরীক্ষার বাহন হইল ইংরেজী। প্রথমটা মাতৃভাষা পরীক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অন্যতম ছিল এবং তাহার পরীক্ষা লওয়া হইত; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সে ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। অনেককাল পরে আবার মাতৃভাষা পরীক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে স্থান পায়; কিন্তু উচ্চশিক্ষিতের মধ্যে মাতৃভাষাচর্চার প্রসারের কোনো ব্যবস্থাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে করা হয় নাই। মাতৃভাষার অনাদর যেন তখন আমাদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হইয়া গিয়াছিল।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার প্রাধান্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করিয়া মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন কিভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া

গেল তাহাও বলিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার কি প্রভাব ঘটিয়াছিল তাহার উল্লেখ এইখানে প্রাসঙ্গিক হইবে।

শিক্ষার বাহন হইল ইংরেজী ; ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি সকল বিষয়ই ছাত্রদের ইংরেজীর সাহায্যে শিখিতে হইল। ফলে যে কোনো বিষয়েই শেখার বাধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল; এক তো বিষয়ের বাধা, দ্বিতীয়ত ভাষার বাধা। এই ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া তবে বিষয়ের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু কয়টি ছেলেমেয়ে ভালো করিয়া ইংরেজী শিখিতে পারে ? স্থতরাং সকলেই সহজ পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। যেখানে পরীক্ষায় পাস করাটাই শিক্ষাব্যবস্থার ফলবিচারের একমাত্র মাপকাঠি, যেখানে বিদেশী ভাষার সাহায্যে অধীত বিদ্যা কোনোমতে বিদেশী ভাষায় পরীক্ষাপত্রে উদ্‌গীরণ করিয়া দিলেই হইল, সেখানে না শিখিয়া মুখস্থ করাই সহজ ; তাহাতে বুদ্ধিও খরচ করিতে হয় না, লেখাপড়া শেখার কষ্টও কম হয়। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা না করিয়া স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করা যাক, তাহারই অনুশীলন করা হোক। কে কত মুখস্থ করিতে পারে দেখা যাক। বিদ্যার্জনশ্রম লাঘব করিবার এই শুভ চেষ্টায় সহায়কও জুটিয়া গেল ; নোটবইকর্তারা জাল নোটে বাজার ছাইয়া দিল, নকল আসিয়া আসলকে সিংহাসনচ্যুত করিল।

১৮৮২ সালের শিক্ষা-কমিশন

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার আরম্ভ হইতেই ইহাতে আর একটি ত্রুটি ছিল। এই শিক্ষা নেহাতই পুঁথিগত শিক্ষা ; তাহাতে ব্যাবহারিক শিক্ষার কোনো স্থান ছিল না। একটা দেশের সকলেই পুঁথি লইয়া দিন কাটায় না ; বেশির ভাগই হয় কর্মী ; হাতেকলমে তাহাদের কাজ ; পুঁথির সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ কম। স্থতরাং তাহাদের শিক্ষা ব্যাবহারিক ধরণের হওয়াই বাঞ্ছনীয় ; ইহার অর্থ এই নয় যে তাহাদের প্রথম হইতে বৃত্তি

শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যাবহারিক শিক্ষামাত্রেই বৃত্তিশিক্ষা নয় : কিন্তু বেশির ভাগ বৃত্তিশিক্ষার মূলে ব্যাবহারিক শিক্ষা। তাহা ছাড়া একদল ছাত্র ব্যাবহারিক শিক্ষার ভিতর দিয়া যত সহজে শেখে অন্যভাবে অর্থাৎ পুঁথির সাহায্যে তত সহজে পারে না। এইজন্যই শিক্ষাব্যবস্থামাত্রেই ব্যাবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম আমলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাহার কোনো স্থান ছিল না। ইহার মূলেও শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজীর ব্যবহার। এক হিসাবে তো ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের কাছে বৃত্তিশিক্ষা হইয়া উঠিয়াছিল অর্থাৎ ইংরেজী শিখিলেই বৃত্তির ব্যবস্থা হইত। আর-এক দিকে ইংরেজী বাহনের ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনতার কোনো অবকাশ ছিল না ; অর্থাৎ সেখানে স্বাধীনভাবে পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের বা পাঠ্যক্রম তৈয়ারি করিবার সুযোগ ছিল না। যেখানে কাঠামোটা ফরমায়েশী সেখানে নূতন কিছু করা কঠিন। এইজন্যই যতক্ষণ না বাহির হইতে ব্যাবহারিক শিক্ষার ফরমাশ আসিল আমরা আপনার তাগিদে তাহার ব্যবস্থা করিলাম না। বিজ্ঞান ও যন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থাও অনেকদিন পরে হইল। ১৮৮২ সালের আগে এ দিকে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি পড়িল না।

উডের ডেসপ্যাচে বৃত্তিশিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ ছিল ; কিন্তু সে বৃত্তি উচ্চবর্ণের— আইন চিকিৎসা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ভদ্রলোকের বৃত্তি। ডেসপ্যাচে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইল। অবশ্য তাহার অনেক আগেই ১৮৩৫ সালে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ খোলা হইয়াছিল ; আইন শিক্ষার বন্দোবস্তও ক্রমে হইল। গবর্মেণ্টের পূর্তবিভাগে কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইল। কিন্তু একে তো ইহাদের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, তাহা ছাড়া আইন ছাড়া অন্য আর দুই রকমের বৃত্তিশিক্ষাও লোকে চাকরিরই জন্য গ্রহণ করিল ; অল্প

কয়েকজন স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে গেল বটে কিন্তু বেশির ভাগ ছাত্রই মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকরির সন্ধান করিতে লাগিল এবং প্রথম প্রথম কাহারও চাকরির অভাব ঘটিল না। এ দেশে তখনও স্বাধীনভাবে ইঞ্জিনিয়ারের ব্যবসায় চালাইবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই।

সুতরাং আমাদের প্রায় সকল প্রকার উচ্চশিক্ষারই লক্ষ্য হইল চাকরি। স্বাধীনভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের পথ তখন আমাদের পক্ষে রুদ্ধ; দেশের বাণিজ্য বিদেশীর করতলগত, পুরাতন শিল্পগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নূতন কোনো শিল্পেরও সৃষ্টি হইল না। আমাদের শোনানো হইল শিল্পচর্চা আমাদের জন্য নয়, চিরকাল ধরিয়া আমরা নাকি ভূমিকেই আশ্রয় করিয়া আছি, সেই ভূমিলক্ষ্মীর সেবা আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনা। সুতরাং যখন ইংলণ্ডে ও ইউরোপে বিজ্ঞানের চর্চার ফলে নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে লাগিল তখন আমরা হয় সরকারী চাকরি করিবার নাহয় বিলাতের বাজারে কাঁচামাল জোগাইবার ও এ দেশে বিলাতী মাল কাটাইবার জন্য যে বড় বড় বিলাতী হৌস ছিল তাহাতে কেরানীগিরি করিবার চেষ্টায় ফিরিলাম: বড় জোর এই সব হৌসে দালালি করিয়া 'ব্যবসায় করিতেছি' এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। উচ্চশিক্ষা লাভের সাক্ষাৎ ফল ইহার চেয়ে আর বেশি কিছু হইল না।

এইভাবে অনেকদিন কাটিয়া গেল; ভারত-সরকার নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী উডের ডেসপ্যাচে নির্দিষ্ট নীতির হেরফের করিয়া শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ১৮৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন বসিল। ১৮৫৪ সালের শিক্ষানীতি ঠিকমত চলিতেছে কি না, মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি ঘটিয়াছে কি না এইগুলিই হইল কমিশনের আলোচনার বিষয়। কমিশনের সভ্যদের

মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জাস্টিস তেলাং প্রভৃতি।

তখন উদারপন্থী লর্ড রিপন ভারতবর্ষের বড়লাট। তাঁহার মাথায় দেশের লোকের সহিত সহযোগিতার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ ঘুরিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আদর্শ প্রথম প্রচার করা হয় উডের ডেসপ্যাচে। সেই আদর্শেই সাহায্য (গ্র্যাণ্ট) নীতির প্রবর্তন করা হয়। তাহার ফলে মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছিল; কারণ এই শ্রেণীর শিক্ষা অর্থকরী বলিয়া তাহাদের চাহিদা খুবই ছিল। সরকার এই শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছিলেন, এই ধরণের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বহু স্থাপিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ হইতেছিল না। ইহাই ছিল সেদিনকার সমস্যা। একে তো প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক মূল্য কিছুই নাই, দ্বিতীয়ত, যাহাদের জন্য এই শিক্ষার আয়োজন তাহারা নিজেদের অভাব বুঝিয়া শিক্ষার জন্য দাবি করিতে পারে এমন তাহাদের শক্তি ও বুদ্ধি নাই; জ্ঞানের অভাবে তাহাদের মন তখনও অতখানি বিকশিত হয় নাই। অতএব তাহাদের ভিতর শিক্ষার তাগিদ ছিল না। তাহার উপর সরকারের তরফে ছিল অর্থের অভাব।[১] সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষা তেমন অগ্রসর হইতেছিল না।

এই অবস্থায় লর্ড রিপন আইন করিয়া কতকটা বিলাতের কাউন্টি কাউন্সিলগুলির আদর্শে ডিস্ট্রিক্ট ও লোকাল বোর্ডগুলি প্রতিষ্ঠা

১ এই অভাব মিটাইবার জন্য ১৮৭০ সালের কাছাকাছি সময়ে শিক্ষাকরের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বাংলা-সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোহাই দিয়া শিক্ষাকর বসাইতে আপত্তি করেন। ভারত-সরকার এই আপত্তি গ্রাহ্য করেন না এবং ধীরে ধীরে যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে শিক্ষাকর বসানো হয়; কিন্তু নানা কারণে ভারতসরকারের মঞ্জুরি সত্ত্বেও বাংলাদেশে আর কর বসানো হইল না।

করিলেন। শিক্ষা-কমিশনও নির্দেশ দিলেন যে, এই সকল স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিতে হইবে। এতদিন এমন কোনো বেসরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না যাহার উপর এই ভাবের ভার দেওয়া যায়। লর্ড রিপনের আইনের পর সে বাধা অপসারিত হইয়াছিল। শিক্ষা-কমিশনও ভাবিয়াছিলেন এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দিলে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের আর কোনও বাধা থাকিবে না। তাহাদের উৎসাহে দেশের চারি দিকে শিক্ষা ছড়াইয়া পড়িবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য কমিশন দেশের প্রাচীন পাঠশালা-গুলি সংস্কারের কথাও বলিলেন। যদি ইহাদের ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে হয়তো প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যার সমাধান সহজ হইবে। কিন্তু তখনকার অবস্থায় সে চেষ্টা যে সফল হওয়া কঠিন ছিল কমিশন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। যদি সেদিন সরকার দায়িত্ব না এড়াইয়া নিজের হাতে প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইতেন তাহা হইলেও হয়তো কিছু হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হইল না। গবর্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব নিজের কাঁধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নবগঠিত বোর্ডগুলির হাতে সে ভার অর্পণ করিলেন।

কমিশনের আর একটি নির্দেশ ছিল হাই ইস্কুলে এণ্ট্রেন্স কোর্সের মতই আর-একটি কোর্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার নাম দেওয়া হইবে 'বি. কোর্স'। বি. কোর্সে ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। যাহারা ব্যবহারিক শিক্ষা চায়, যাহাদের সাধারণ শিক্ষার দিকে ঝোঁক নাই বা সে শিক্ষার ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে যে ধরণের বুদ্ধির প্রয়োজন সে ধরণের বুদ্ধি যাহাদের নাই তাহারাই বি. কোর্স পড়িবে এবং বি. কোর্সের পরীক্ষা দিবে।

বি. কোর্সের ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু তাহাতে কোনোদিনই বেশি ছাত্র জুটিল না। তাহার একটা কারণ, লোকের মনে এণ্ট্রেন্সের তুলনায় বি. কোর্স জাত্যংশে ছোট ছিল; সেখানে ছুতোর-কামারের কাজ শিখিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে তাই বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। এইভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ব্যাবহারিক করিয়া তোলার একটা চেষ্টা বিফল হইল।

কিন্তু এই সময়েই ড্রয়িং বিজ্ঞান প্রভৃতি নূতন কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পাইল। তাহাতে পাঠ্যক্রমের ভার বাড়িল বটে, কিন্তু তাহার মৌলিক কোনো রূপান্তর ঘটিল না।

যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থার কথাটা কমিশন এড়াইয়া গেলেন। ব্যাবহারিক শিক্ষাই যথেষ্ট, যান্ত্রিক শিক্ষার এখনও আবশ্যকতা নাই, কমিশন কতকটা এইভাবের মত দিলেন।

কমিশনের আর-একটা নির্দেশ ছিল— নীতিশিক্ষা দিবার জন্য একটা পাঠ্যপুস্তক তৈয়ারি করিতে হইবে। মিশনারীরা সরকারী ও বেসরকারী সকলপ্রকার বিদ্যালয়েই ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৪ সালেই সরকার ধর্মব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সরকারী বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়াইবার এই অন্যায় মিশনারী দাবি তাঁহারা স্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন নীতিশিক্ষার দাবি উঠিল। ধর্মহীন নীতিহীন শিক্ষা ছেলেমেয়ের সর্বনাশ সাধন করিবে, ইহার একটা প্রতিকার চাই, এই রব উঠিল। তাহারই ফলে কমিশন এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারত-সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না।

কার্জনী আমল ও স্বদেশী যুগ

শিক্ষা-কমিশনের সময় হইতে এই শতাব্দীর শেষের মধ্যে এ দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো বিশেষ নীতির পরিবর্তন ঘটে নাই ; যে নীতি এতদিন অনুসরণ করা হইতেছিল তাহাই অনুসরণ করা হইতে লাগিল। কমিশনের চেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষার ধারা যে পথে এতদিন বহিয়া আসিতেছিল সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথে গেল না ; অর্থাৎ পূর্বেরই মত এখনও মধ্য ও উচ্চ-শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইতে লাগিল, দেশে হাই স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু স্বায়ত্তশাসক প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার মোটেই আশানুরূপ হইল না। তাহার উপর এই সময়ে (১৮৮৮ সালে) আবার ভারত-সরকার শিক্ষা-ব্যাপারে ব্যয়সংকোচ করিবার কথা তুলিলেন। তাঁহাদের যুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের কাজ পথ দেখানো ; এখন যখন পথ দেখানো হইয়া গিয়াছে, কাজ শুরু হইয়াছে তখন সরকারের কাজও শেষ হইয়াছে। সরকার এখন শিক্ষার দায়িত্ব দেশবাসীর হাতে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইবেন। এখন হইতে শিক্ষাব্যাপারে সরকারী ব্যয় ক্রমশ কম করা হইবে।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে দেশময় সাড়া পড়িয়া রাজনৈতিক জাগরণের সূচনা দেখা দিল এবং ১৮৮৫ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারত-সরকার প্রথমে কংগ্রেস সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব দেখাইলেও শীঘ্রই তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইল। জাতীয়তার এই জন্ম তাঁহারা সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন।

শিক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রথম হইতেই কয়েকটি দাবি জানাইলেন। শিক্ষাবিস্তারের আরও ব্যবস্থা করিতে হইবে, শিক্ষাধারাকে জাতীয় ভাবাপন্ন করিতে হইবে, যন্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি।

ইতিপূর্বেই দেশের একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি শিক্ষাসংস্কারের, বিশেষ করিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসও সেই আন্দোলন সমর্থন করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ শতকে কয়েকটি নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লাহোরে দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক কলেজ ও কাশীতে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। সেখানে শিক্ষার আদর্শের মধ্যে ধর্মকে স্থান দেওয়া হইল। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় এবং মুনশীরাম হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানই সাধারণ শিক্ষায়তনগুলি হইতে স্বতন্ত্রধরণের হইল; উভয়স্থানেই প্রাচীন আদর্শের ভিত্তিতে নবীন ও প্রাচীনের সমন্বয়ে নূতনধরণের শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইল। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং এ দেশীয় ধর্মকে আসন দিবার, শিক্ষার প্রকৃতিকে দেশীয়ভাবাপন্ন করিবার একটা চেষ্টা এই সময়ে দেখা গেল।

এমন সময় কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই সিমলায় প্রাদেশিক ডিরেক্টরগণের এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন; সেই সভায় শিক্ষানীতি লইয়া অনেক আলোচনা হইল। সেখানে বড়লাট তাঁহার পরিকল্পিত নূতন নীতি ব্যাখ্যা করিলেন। শিক্ষা-ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না; বরং, সেখানে নানা-ভাবে সরকারী প্রভাব বেশি করিয়া বিস্তার করিতে হইবে। ইহার জন্য সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, বেশি খরচ বরাদ্দ করিতে হইবে।

একদল লোক ভাবিলেন, দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে যে জাতীয় জাগরণের স্থচনা দেখা দিয়াছে এবং যে জাতীয় মনোভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলির ভিতর দিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, এইভাবে সরকারী

প্রভাব বাড়াইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল সেই জাতীয়তাবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। এই সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হইল যখন কার্জন কর্তৃক নিযুক্ত ইউনিভার্সিটি কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইল।

কার্জন ইউনিভার্সিটি কমিশন বসাইয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য। সে সংস্কার যে প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ১৮৫৭ সালের পর পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ এই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং কার্জনের সময়ে দেশে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান। ইহাদের শাসন ও পরিচালন-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক গোলমাল ছিল। তাহা ছাড়া ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট ছিল না; বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পাঠ্য নির্দেশ করিয়া এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, ইস্কুল কলেজে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার উপর তাহার বিশেষ কোনো হাত ছিল না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ ছোটবড় নানা সমস্যা সেদিন দেখা দিয়াছিল।

ইউনিভার্সিটি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার নির্দেশ দিলেন। তাহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের প্রভাব না কমিয়া বাড়িবার ব্যবস্থাই হইল। নূতন বিধানে যে একশত ফেলো বা সদস্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা পরিচালক সমিতি গঠিত হইবে তাঁহাদের মধ্যে ৮০ জনই সরকার-মনোনীত হইবেন। এই ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে স্বাধীনতা কতখানি পরিমাণে রক্ষিত হইবে দেশবাসীর পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে মত দিলেন; কিন্তু তাঁহার মত গ্রাহ্য হইল না। দেশেও এই ব্যাপারে খুব আন্দোলন হইল; কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইল না। ইউনিভার্সিটি বিল পাস হইয়া আইনে

পরিণত হইল; কার্জন এ দেশের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার যে সংস্কার চাহিয়াছিলেন তাহা আরম্ভ হইল।

১৯০৪ সালে কার্জন তাঁহার শিক্ষানীতি ঘোষণা করিলেন। তাহাতে তিনি এ দেশের শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সেগুলি দূর করিবার উপায় নির্দেশ করিলেন। মাতৃভাষার অবজ্ঞা, পরীক্ষার প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথাই তিনি বলিলেন। তাঁহার অনেক কথাই ঠিক; কিন্তু গোল হইল সেখানে নয়, অন্যত্র।

শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন যে এ দেশের লোক বোঝে নাই তাহা নহে, বস্তুত আমাদের ব্যবস্থার অনেক সমালোচনাই অনেকদিন ধরিয়া শোনা যাইতেছিল। কিন্তু কার্জন যেভাবে শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিলেন ইহার পিছনে কোনো গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে। একদল লোক বলিলেন, কার্জনের নূতন ব্যবস্থা ভারতের শিক্ষার প্রসার বন্ধ করার একটা ফিকিরমাত্র।

এমন সময়ে কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা করিলেন। এই ব্যাপারে দেশময় ক্ষোভের সঞ্চার হইল। তাহাই স্বদেশী আন্দোলনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করিল। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের পরিচয় আমরা পাইলাম তাহাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় প্রকার আদর্শ মিলিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এদেশের ছাত্রগণ প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিল। সরকার সেটা সুনজরে দেখিলেন না। বাংলা গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী রিসলি এক সার্কুলার বাহির করিলেন, ইস্কুলের ছেলেরা যেন সভাসমিতিতে যোগ না দেয়, দিলে কড়া শাসন করা হইবে। ছেলের দল ক্ষেপিয়া গেল।

দেশের নেতাদের মনের মধ্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধীভাব জমিয়া উঠিতেছিল। এই ব্যাপারের পর এই বিরুদ্ধ মনোভাব জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন; তাঁহাদের চেষ্টায় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল; দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিল; জাতীয় শিক্ষার বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত হইল এবং উচ্চতম শ্রেণী হইতে নিম্নতম শিশুশ্রেণী পর্যন্ত কোথায় কখন কি পড়ানো হইবে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থির করা হইল। কলিকাতায় ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হইল, অরবিন্দ ঘোষ আসিলেন তাহার অধ্যক্ষ হইয়া। যন্ত্র শিক্ষার জন্য টেকনিকেল স্কুলও খোলা হইল। বাংলাদেশের নানাস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ছেলের দল ভিড় করিয়া আসিল।

ইহাই এদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন। ইহার পূর্বে সরকারী ব্যবস্থা হইতে দূরে নূতন ভাবের শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়ভাবে শিক্ষা দেওয়া। গুরুকুল এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ও মুন্সীরাম উভয়ের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ এক না হইলেও উভয়েই দেশের ভাষার সাহায্যে জাতীয়ভাবের শিক্ষা দিবার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই আদর্শে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন।

নানাকারণে জাতীয় শিক্ষা -আন্দোলন বেশি দিন থাকিল না। রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ভাবধারার জোয়ারের মুখে যাহা আসে আন্দোলনে ভাটা পড়িলে তাহার বেশির ভাগই সরিয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন মন্দী-ভূত হইয়া আসিল। ন্যাশনাল কলেজ বন্ধ হইল, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি

উঠিয়া গেল, বেশির ভাগ ছাত্রই সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ফিরিয়া গেল ; রহিল শুধু বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিট্যুট ; তাহা আজ বিরাট যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনলজিতে পরিণতি লাভ করিয়াছে। টেকনিকাল ইস্কুল থাকিয়া গিয়া প্রমাণ করিল যে দেশে যন্ত্রশিক্ষার তাগিদ আছে এবং সে ধরণের শিক্ষার জন্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি ক্রমে হইতেছে। বস্তুত তখন হইতেই দেশের সর্বত্র একটির পর একটি করিয়া যন্ত্রবিদ্যা-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে লাগিল।

স্বদেশী আন্দোলনের কিছুকাল পরে মর্লি-মিণ্টো পরিকল্পিত শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার উল্লেখ সাধারণত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এখানে ইহার প্রয়োজন আছে ; কারণ এই ঘটনাটির ফল অনেকদূর পর্যন্ত গিয়াছে। সকলেই জানেন এই সময়েই আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়। ভারত-সরকার নানাভাবে সাম্প্রদায়িকতা নীতির সমর্থন করেন। নূতন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা এই ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দেয়। তাঁহাদের সমর্থন না পাইলে সাম্প্রদায়িকতা যে বেশি দিন টিকিত না এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। একদল লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া হয়তো খানিকটা গোলমাল করিত ; কিন্তু সে গোলমাল বেশি দিন পর্যন্ত থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না ; প্রশ্রয় পাইয়া সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। শুধু মুসলমানদেরই জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানের দাবি তাহাদের অন্যতম। দেখাদেখি হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ দাবি উঠিল। সরকার সে দাবি অগ্রাহ্য করা দূরে থাক্ তাহা সমর্থন করিলেন।

এইভাবে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রবেশ করিল।

গোখলের বিল ও ১৯১২ সালের শিক্ষানীতি

স্বদেশী আন্দোলনের সময়েই এদেশে প্রথম ব্যাপকভাবে বয়স্কশিক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল। তখন বয়স্কদের শিক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বহু নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠেন। দেড়শত বৎসর ব্রিটিশ শাসনের পরও যে দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা শতকরা পাঁচ-ছয়জনের বেশি হয় নাই এই দৃষ্টিকটু ব্যাপারটি এই সময়ে সকলের চোখে পড়ে এবং এই লইয়া নানা আলোচনার সৃষ্টি হয়।

ইহার সহজ ও স্বাভাবিক প্রতিকার ছিল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। সরকার মুখে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও কার্যত কিছুই করিতেছিলেন না। এমন সময়ে ১৯১১ সালে গোখলে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিল উপস্থিত করিলেন। বিলের দাবি বেশি নহে; যদি কোনো প্রাদেশিক সরকার মনে করেন কোনো বিশেষ স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইলে সেখানে আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হইবে; তাও শুধু ছেলেদের জন্যই, মেয়েদের লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য করা হইবে না।

এই সামান্য দাবিও ভারত-সরকার স্বীকার করিলেন না। সরকার-পক্ষের মুখপাত্র সার্ হারকোর্ট বাটলার বলিলেন প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার কথা উঠিতেই পারে না; এখনও দেশ তাহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। গোখলে যখন বরোদার (বরোদা রাজ্যে অনেক আগেই প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা হইয়াছিল) নজির দেখাইলেন তখন বাটলার উহা গণতান্ত্রিক প্রথায় শাসিত রাজ্য নহে বলিয়া উড়াইয়া দিলেন; উত্তরে যখন গোখলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কথা বলিলেন তখন

হারকোর্ট বাটলার সে নজিরও স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। গোখলে হতাশ হইয়া বলিলেন, দেশী রাজ্যের উদাহরণ দিলে স্বৈরতান্ত্রিক রাজ্য বলিয়া সে উদাহরণ বাটলার সাহেব স্বীকার করিবেন না, তিনি গণতান্ত্রিক দেশের উদাহরণ চাহিবেন, তখন পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির নজির তুলিলে সেগুলিও তিনি মানিতে চাহিবেন না। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের অনুরূপ বিচিত্র শাসনতন্ত্রের উদাহরণ কোথায় পাইব? সরকার-পক্ষ মানিয়া লইতে পারেন এমন কোন্ নজির দিব?

সরকারের বিরোধিতায় গোখলের সকল যুক্তি ও চেষ্টা ব্যর্থ হইল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অধিকাংশ সভ্যের ভোটের জোরে গোখলের বিল নাকচ হইয়া গেল।

গোখলের বিল লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন হয়। সরকার-অনুগৃহীত একদল মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া দেশের প্রায় সকলেই এই বিল সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান ধনী নির্ধন, সকল সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া সকল রাজনৈতিক দলই গোখলের বিলের পক্ষে ছিলেন।

এই অবস্থায় ভারত-সরকার যখন বিলের বিরোধিতা করিলেন তখন তাঁহাদের পক্ষে সাফাই গাহিবার, এ বিষয়ে তাঁহাদের নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার একটা প্রয়োজন হইল। এমন সময়ে দিল্লিতে দরবার বসিল; স্বয়ং ভারতসম্রাট এদেশে আসিলেন; দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারের কথা বলিলেন। এই উপলক্ষে ও এই সুযোগে ভারত-সরকার আর একবার তাঁহাদের শিক্ষানীতি ঘোষণা করিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহারা বলিলেন, যদিচ তাঁহারা গোখলের বিলের বিরোধিতা করিয়াছেন তথাপি তাঁহারাও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার

চান। সুতরাং এখন হইতে তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আরও অনেক অর্থ বরাদ্দ করিবেন। দরবার উপলক্ষে শিক্ষার জন্য যে অতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য খরচ করা হইবে।

১৯১২ সালের নীতির মধ্যে দুইটি নূতন কথা শোনা গেল। প্রথমটি মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে, দ্বিতীয়টি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার সম্বন্ধে।

এতদিন পর্যন্ত পরীক্ষা অনুমোদন প্রভৃতি কয়েকটা ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হাই স্কুলগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতেছিল। লর্ড কার্জন ইচ্ছা করিয়াই এই কর্তৃত্বের ভার তাহাদের উপর দিয়াছিলেন। তাহাতে শিক্ষাবিভাগের অধিকার খর্ব করিবার কোনো কথাই ছিল না। তাহার একটা কারণ, তখন শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না এবং এমন-কোনো বিরোধ যে ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে তাহাও কাহারও মনে হয় নাই।

ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন হইল, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বহুল পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বাধীনভাবে সরকারী আওতার বাহিরে চলিতে লাগিল ; এমন-কি, শোনা যায় নাকি একটি বিদ্যালয়ের অনুমোদন বন্ধ করিবার ব্যাপারে একটি প্রদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ছোটলাটের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় লাটসাহেবের অভিপ্রায়মত না চলায় লাটসাহেব চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যান। এ অবস্থায় সরকারী শিক্ষাবিভাগের গাত্রদাহ হইবারই কথা। তাঁহাদের ভাবটা যেন বিশ্ববিদ্যালয় অন্যায়ভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপর কর্তৃত্ব করিতেছে ; অযোগ্য বিদ্যালয়কে অনুমোদন করিয়া তাহারা অনুমোদনের অধিকারের অপব্যবহার করিতেছে এবং শিক্ষার উন্নতি করা দূরে থাক ক্ষতিই করিতেছে। অতএব অনুমোদনের অধিকার তাহাদের

হাতে না রাখিয়া এই ভার অন্য কাহারও উপর দেওয়া প্রয়োজন। পরবর্তীকালে সেকেণ্ডারী বোর্ডের যে কথা ওঠে এখানেই তাহার প্রথম আভাস আমরা পাই।

সরকারের এই যুক্তির সমর্থনে আরও বলা হইল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজ বস্তুত মধ্যশিক্ষা লইয়া নহে, উচ্চশিক্ষা লইয়া। মধ্যশিক্ষার দিকে নজর দিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের কাজ ঠিকমত করা হইতেছে না। সুতরাং মধ্যশিক্ষা সংস্কারের জন্যও বটে আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজেদের সুবিধার জন্যও বটে, কাজের ভাগ করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন, পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে। তাহা হইলে উভয়পক্ষেই সুবিধা হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ যে-সকল সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সহজ হইয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আদর্শের, নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠিল।

বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি কয়েক রকমের হইতে পারে। এক, প্রাচীনকালের নালন্দা, বিক্রমশীলা বা বর্তমানকালের অক্সফোর্ড কেমব্রিজের মতো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে ছাত্রগণ বাস করিয়া জ্ঞানচর্চা করে, সেখানে দৈনন্দিন সামাজিক জীবন প্রাচীন গুরুগৃহেরই মতো সুসংহত সুনিয়ন্ত্রিত। সেখানে ছাত্রগণ অহরহ জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকদিগের স্পর্শ লাভ করে এবং সেই সান্নিধ্যের ফলে, সেই পরিবেশে বাস করিয়াই তাহাদের সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা হয়। ইহাই ছিল এদেশের প্রাচীন আদর্শ। আর এক ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি ; তাহার উদাহরণ লণ্ডন এবং তাহারই আদর্শে গঠিত এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এগুলিতে ছাত্রগণের বাসের বিশেষ কোনো বিধিনিষেধ নাই, তাহারা স্বগৃহে

বা অন্য কোথাও থাকে ; দিবসের মধ্যে কোনো-একটা নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে, লেখাপড়া করে এবং লেখাপড়া শেষ হইলে ঘরে ফিরিয়া যায়। এখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন। এখানে ছাত্রগণের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ কোনো প্রভাব নাই এবং সেরূপ প্রভাব বিস্তারের বিশেষ কোনো চেষ্টাও নাই। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এইভাবের অনেক কথাই বলা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল কলিকাতা ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু সেগুলি সে ধরণের ছিল না। বস্তুত সেগুলিকে তৃতীয় আর-এক শ্রেণীর মধ্যে ফেলাই ঠিক হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাক্ষাৎভাবে লেখাপড়া শিখাইবার কথা বলা হইয়াছে ; শুধু সেখানে ছাত্রগণ দিনরাত্রি বাস করিবে না ; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে এইটুকুই প্রভেদ। এখানে যে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতেছি সেখানে সাক্ষাৎভাবে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও থাকে না। সেখানে লেখাপড়া শেখানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত বিভিন্ন কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অনুমোদন, পাঠ্যনির্ধারণ, পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিবিতরণ করিয়া ক্ষান্ত। এক হিসাবে সে ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় নামে অভিহিত করা সমীচীন নহে, কারণ সেখানে কোনো বিদ্যারই চর্চা নাই। বস্তুত সেগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নহে, পরীক্ষাকেন্দ্র। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেখানে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানচর্চার কোনো আয়োজন ছিল না। ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের যে চেষ্টা হয় তাহাতে আইনের সংস্কার হয় বটে কিন্তু কার্যত বিশেষ কিছুই হয় নাই।

১৯১২ সালের শিক্ষানীতিতে সরকারের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের কথা তোলা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের উল্লেখ করা হয়। পুরাতন তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারের ক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া ভালো ভালো কলেজগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ছোট ছোট প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শুধু পরীক্ষাকেন্দ্র না করিয়া প্রকৃতই সকল বিদ্যার আলয় ও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গেই আমরা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার আদর্শের সরকারী সমর্থন দেখিতে পাই। সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের নীতি সমর্থন করিয়া বলা হয়, সরকার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় উভয় বিদ্যালয়কেই যথাযথ অর্থসাহায্য করিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও এইখানে উল্লেখ করা হয়। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে একদল কিছুদিন হইতে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি জানাইয়াছিলেন। ভারত-সরকার স্পষ্টই বলিলেন, সে দাবি তাঁহারা সমর্থন করিবেন। বিভিন্নপ্রদেশের জন্য প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে পাটনা ও নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা হয়।

১৯১২ সালের শিক্ষানীতি ঘোষণার কিছুদিন পরেই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য নূতন এক কমিশন বসাইবার কথা ওঠে।

দেখা গিয়াছে, যখনই ইংলণ্ডে শিক্ষাসংস্কারের কথা উঠিয়াছে তাহার কিছুকালের মধ্যে এদেশেও অনুরূপ সংস্কারের চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে করা হইয়াছে। দুইটি চেষ্টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কোথাও পাঁচ বৎসর, কোথাও দশ বৎসর হইয়াছে। ১৯১০ সালে লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য লর্ড হলডেনের নেতৃত্বে রয়াল কমিশন

বসিয়াছিল। ১৯১৪ সালে তাঁহারই নেতৃত্বে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য এক কমিশন বসাইবার প্রস্তাব হইল। লর্ড হলডেন অবশ্য আসিতে রাজী হইলেন না। এমন সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদেশেও শিক্ষাসংস্কারের এবং শিক্ষাবিস্তারের সকল কথা ও চেষ্টা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের আরম্ভ

১৯১৭ সালে যুদ্ধের অবস্থা কতকটা ভালো হইয়াছে। তাই তখন শিক্ষাসংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিবার খানিকটা সুযোগ ঘটিল। এই সুযোগে ভারত-সরকার কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। বিলাতের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মাইকেল স্যাডলার হইলেন কমিশনের সভাপতি। তাঁহারই নামে ইহা স্যাডলার কমিশন নামে পরিচিত। কমিশনের এদেশী সভ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অনেকে মনে করেন কমিশন বহুল পরিমাণে তাঁহার মতামতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল।

যদিচ কমিশনের ব্যক্ত উদ্দেশ্য হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া তবুও ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল সেই সম্বন্ধে সমগ্রভাবে আলোচনা করাই যে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এটা মনে করা অসংগত হইবে না। বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করিয়া দেশে এই ধরণের শিক্ষার সংস্কার কি ভাবে করা যায় কমিশন তাহাই আলোচনা করিলেন; কমিশনের সভ্যগণ সারা ভারতবর্ষ ঘুরিলেন, দেশের সর্বত্র ছোট বড় নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখিলেন, শিক্ষাবিদ্‌গণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁহাদের

শিক্ষাসংস্কারের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। স্যাডলার কমিশন সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যে দুই-একটি ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথম ব্যাপারটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

১৯১৬ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের চেষ্টায় নূতন আদর্শে কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কয়েকটি বিষয়ে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। প্রথমত, এখানে সাক্ষাৎভাবে প্রবেশিকার পর হইতে এম. এ. পর্যন্ত সকল প্রকার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়; দ্বিতীয়ত, ইহা পুরাপুরি না হইলেও অনেক পরিমাণে আবাসিক। তৃতীয়ত, এই বিশ্ববিদ্যালয়েই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক আদর্শ প্রথম সুস্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আর-একটি ব্যাপার লক্ষ করিবার মতো। এতদিন পর্যন্ত এদেশে যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকটি সরকারের আগ্রহে এবং সরকারের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসাধারণের চেষ্টায় এই প্রথম সরকার-অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। ইহাতে প্রমাণ হইল যে আগ্রহ থাকিলে এবং গভর্নমেণ্ট বাধা না দিলে এদেশে জনসাধারণের চেষ্টাতেও বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিতে পারে।

এই সময়েই দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ওঠে। এতদিন শুধু ব্রিটিশ ভারতেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; দেশীয় রাজ্যের ছাত্রেরা সেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য আসিত। ১৯১২ সালের পর হইতে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাদেশিকতাবোধ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ এই প্রাদেশিকতাবোধেরই রূপান্তর। সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। ১৯১৭ সালে মহীশূর ও ১৯১৮ সালে হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দুকে উচ্চশিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতনত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা হইল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষাও উর্দুতে দিতে হয়। উর্দুকে শিক্ষার বাহন করায় যেন কেহ না মনে করেন দেশবাসী বহুদিন ধরিয়া মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার যে দাবি করিতেছিল, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই দাবি স্বীকৃত হইয়াছে এবং সেইমত শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে সংস্কার সাধিত হইয়াছে। নিজামের রাজ্যে শতকরা পাঁচজনেরও মাতৃভাষা উর্দু নহে ; সুতরাং সে-রাজ্যের প্রজার পক্ষে ইংরেজী বাহনের ফলে যেরূপ সুবিধা অসুবিধা উর্দু বাহনেরও অনেকটা সেই রকমই সুবিধা অসুবিধা হইল। তবে উর্দুর ব্যবহারে ইহাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হইল যে, যদি সরকার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এদেশী ভাষাকে বাহনরূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ গঠন।

১৯১৭ সালে সার্ আশুতোষের প্রেরণায় ও নেতৃত্বে কলিকাতায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করার ব্যবস্থা হইল। এতদিন এম. এ. এম. এসসি. পড়ার ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন কলেজে। এইবার কলিকাতায় সাক্ষাৎভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাহার ব্যবস্থা করা হইল। এক প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজের এম. এ, এম. এসসি. পড়াইবার অধিকার রহিল না।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়েই সার্ আশুতোষের চেষ্টাতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন কৃতী ছাত্র, সার্ তারকনাথ পালিত এবং সার্

রাসবিহারী ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়কে বহুলক্ষ টাকা দান করিলেন। তাঁহাদের বদান্যতায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য সায়েন্স কলেজ ও ল্যাবরেটারি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইল।

কলিকাতায় পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগের সৃষ্টির ফলে এদেশের অন্তত একটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল। সেখানে উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণার সুযোগ ঘটিল। গবেষণা সম্বন্ধে এই শতাব্দীর প্রথম দিকে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলিয়াছিলেন, এদেশে নাকি গবেষণা সম্ভব নহে, আমরা নাকি গবেষণা করিবার যোগ্য নহি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট বিভাগ কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই কথার উপযুক্ত উত্তর দিল।

এই ভাবে স্যাডলার কমিশনের কাজ আরম্ভ হইবার আগেই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল।

স্যাডলার কমিশন

১৯১৯ সালে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইল। শিক্ষা সম্বন্ধে এত দীর্ঘ এবং প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ইতিপূর্বে আর কখনও বাহির হয় নাই। রিপোর্টে এক প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর প্রায় সকল প্রকার শিক্ষারই আলোচনা ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত সাক্ষাৎভাবে উচ্চশিক্ষার কোনো যোগ নাই বলিয়া কমিশন সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নাই। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষার সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ না করিলে চলে না। এই যুক্তিতে কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কথা বলিতে গিয়া এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের পরামর্শ দিলেন।

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া কমিশন যে মন্তব্যগুলি করিয়াছিলেন এইখানে তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কমিশন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ত্যাগ ও জ্ঞানার্জনস্পৃহার প্রশংসা করিলেন। দারিদ্র্যের জন্য বহু ছাত্র যে মাধ্যমিক শিক্ষা পায় না তাহাও উল্লেখ করিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার যে আরও প্রসার প্রয়োজন সে-কথাও তাঁহারা স্বীকার করিলেন। কিন্তু এখন বিদ্যালয়গুলি যে অবস্থায় আছে তাহাদের সংস্কার না হইলে কোনো উন্নতিই সম্ভবপর হইবে না। তাঁহারা বলিলেন, সকল ত্রুটির মূলে আছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে বেতন দেওয়া হয় তাহাতে যোগ্য লোকের সেখানে কাজ করা কঠিন। অধিকন্তু যাঁহারা শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন তাঁহাদের অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন নাই। তাহার উপর আবার ছাত্রদের দারিদ্র্য। এই সকল কারণ মিলিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা এরূপ হইয়াছে।

সুতরাং শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন। গভর্ণমেণ্টকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা কোনো সংস্কারই সম্ভব হইবে না। কমিশনের মতে সরকারকে ইহার জন্য বৎসরে অন্তত আরও ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কোনো সংস্কারে হাত দেওয়া সম্ভব নহে।

টাকারপরই পরিচালনারব্যবস্থা। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কমিশন নূতন এক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে আর মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হইবে না, কারণ মাধ্যমিক শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয় নহে; সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে সে ভার দিলে শিক্ষাব্যবস্থায় পক্ষপাতদোষ ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এ কাজ

করিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রকৃত যে কাজ তাহাতে বাধা ঘটে। অতএব সবদিক দিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য নূতন ব্যবস্থার দরকার।

এই নূতন ব্যবস্থা হইতেছে নূতন এক বোর্ড গঠন। সে বোর্ড কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কি কি কাজ হইবে, কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা আলোচনা করিয়া সকল বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। বোর্ডের অধিকাংশ সভ্যই বেসরকারী হইবেন। আর যাহাতে জনসাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, সেইজন্য বোর্ডে জনসাধারণের ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধি উপযুক্ত সংখ্যায় রাখিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি থাকিবেন। এইভাবে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট পড়িলে বোঝা যায় যে, তাঁহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের উপর বিশেষ জোর দেন নাই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয়ে চুলচেরা হিসাব করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে ইহা তাঁহাদের অভিমত ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বোর্ডের গঠনের কথাই বলা যায়; যে জন-ষোলোকে লইয়া বোর্ড গঠিত হইবে তাহাতে অন্তত তিনজন হিন্দু ও তিনজন মুসলমান থাকিবে ইহাই তাঁহারা মত দিলেন। বস্তুত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন মুখ্যত রাজনীতির ব্যাপার, শিক্ষানীতির নহে। এইখানে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, কমিশন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন সমর্থন করিলেও পৃথক নির্বাচনের কথা বলেন নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষার উপর সরকারী কর্তৃত্ব কতদূর হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কমিশন বলিলেন, বোর্ডের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সরকার কর্তৃত্ব অবশ্যই করিবেন, কিন্তু যেন তাহার ফলে বোর্ডের ও বিদ্যালয়গুলির

স্বাধীনতা অতিমাত্রায় ক্ষুণ্ণ না হয়, সে কর্তৃত্বে যেন জনসাধারণের স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানের চেষ্টা ব্যহত না হয়। দেশের লোকের সহযোগিতা না পাইলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সার্থক হইতে পারে না, সুতরাং সেরূপ সহযোগিতার পুরা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ড যেন সরকারী শিক্ষাবিভাগের শাখামাত্র না হইয়া ওঠে সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ সেরূপ হইলে বোর্ড জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইবে এবং তাহার উপযোগিতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

কমিশনের মতে কলেজে প্রথম দুই বৎসরে যে কাজ হয় তাহা অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ; অতএব শিক্ষাব্যবস্থার এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে বাদ দিয়া ইহাকে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে জুড়িয়া দিতে হইবে। এই দুই বৎসরের শিক্ষার স্তরের নাম দেওয়া হইল ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা। কমিশন শিক্ষানিয়ন্ত্রণের জন্য যে বোর্ডের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উপর মাধ্যমিক ও ইণ্টার-মিডিয়েট এই দুই প্রকার শিক্ষাপরিচালনা করিবার ভার দেওয়া হইল এবং বোর্ডের নাম করা হইল বোর্ড অব সেকেণ্ডারি অ্যাণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশন। কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষার ভার ইস্কুলগুলির উপর দেওয়া হইল না; তাহার জন্য স্বতন্ত্র দুই বৎসরের কলেজের প্রস্তাব হইল। এই ধরণের কলেজের শিক্ষারীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের কথা বলা হইল।

১৮৮২ সালে শিক্ষা-কমিশন এবং ১৯০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১৯১৯ সালের নববিধানে নূতন নামে সেইগুলিই বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের অমোঘ অস্ত্র বলিয়া গণ্য হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে কমিশন প্রস্তাব করেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি হইবে বি. এ. এবং বি. এ. কোর্স দুই বৎসরের না হইয়া তিন বৎসরের করা হইবে। তিন বৎসর করার পক্ষে তাঁহারা যুক্তি দিলেন, (বিলাতেও এইরকম ব্যবস্থা আছে) ইহার কমে ঠিকমত পড়াশোনা হয় না, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অন্তরের যোগ সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং সেইজন্যই বিদ্যাভ্যাস সার্থক হইবার বাধা ঘটে।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষার পাঠ্য তিন বৎসরের করিয়া দেওয়া, স্যাডলার কমিশনের এই দুইটিই হইল মূল প্রস্তাব।

তাঁহাদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিলে এবং এই দুইটি প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারিলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান ত্রুটি দূর হইবে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রকৃত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা যাইবে। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে কমিশন জোর দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা অবিলম্বে ঢাকায় এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে বলিলেন। এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের জন্য নূতন প্রস্তাব হইল। পুরাতন সেনেট সিণ্ডিকেটের বদলে কোর্ট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এক্সিকুটিভ কমিটির ব্যবস্থা করা হইল। যাঁহারা পড়াইতেন, এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে সেই অধ্যাপকদের বিশেষ কোনো হাত ছিল না। এখন তাঁহাদের কিছু পরিমাণ প্রাধান্য দিবার চেষ্টা হইল। পরিচালকসমিতিগুলিতে তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হইল। ভাইস চ্যান্সেলারের পদ এ পর্যন্ত অবৈতনিকই ছিল, কমিশন সে পদ বৈতনিক করিতে বলিলেন।

শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলির বিষয়েও কমিশন নানা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন এবং অনেক নূতন প্রস্তাব করিলেন। বস্তুত প্রাথমিক শিক্ষা বাদে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার এমন-কোনো দিক ছিল না যে-বিষয় তাঁহারা

আলোচনা করেন নাই বা যে-বিষয়ে তাঁহারা নূতন কোনো প্রস্তাব করেন নাই। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যবান আর কোনো রিপোর্ট ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। পরবর্তী কালের শিক্ষাধারার গতি বহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজও ইহার প্রভাব একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

স্যাডলার কমিশনের ফলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব একটা নাড়াচাড়া পড়িয়া যায় এবং নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ১৯২০ হইতে ১৯৩০ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে আটটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের সবগুলিই যে নূতন আদর্শে গঠিত হইল তাহা নহে; কতকগুলি পুরাতনেরই অনুকরণ করিল, আবার কতকগুলি নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিল। ১৯২১ সালে ঢাকায় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ১৯২৭ সালে আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী দূরে থাক একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে গঠিত। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের বাস ও শিক্ষার আয়োজন বা কেন্দ্রীভূত পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা এই দুইয়ের কোনোটাই নাই। আগ্রার পর ১৯২৯ সালে অন্নমলই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর ১৯৩৭ সালে ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পর আর-কোনো নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয় নাই। ত্রিবাঙ্কুরকে লইয়া এ পর্যন্ত এদেশে মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে সর্বশুদ্ধ প্রায় সওয়া লাখ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে।

কমিশনের প্রস্তাবের ফলে কয়েকটি প্রদেশে সেকেণ্ডারি ও ইণ্টার-মিডিয়েট শিক্ষা বোর্ড গঠিত হইল। ঢাকাতে বোর্ড স্থাপিত হইল; কিন্তু

এই বোর্ড গঠনের ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও গভর্নমেণ্টের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়ায় বাংলাদেশে কোনো বোর্ড গঠিত হইতে পারে নাই। ঢাকা বাদে বাংলাদেশে এখনও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব পূর্বেরই মতো আছে। ইহাতে কোনো ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহা বলা কঠিন ; কারণ অন্যত্র যেখানে যেখানে বোর্ড গঠিত হইয়াছে সেখানে যে মোটের উপর মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, একথা কেহই জোর গলায় বলিতে পারিতেছে না।

একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি। স্যাডলার কমিশন যে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন তাহার খরচ অনেক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এরূপ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা দরকার। এই গরিব দেশে সে টাকা কোথা হইতে আসিবে ? যদি গভর্নমেণ্ট টাকা দেন তবেই তাহা সম্ভব, নতুবা নহে। অন্য ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় সুবিধা, তাহার খরচ তুলনায় অনেক কম। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রের যে খরচ লাগে এদেশের অধিকাংশ পিতামাতাই তাহা বহন করিতে পারেন না। লণ্ডন বা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক নহে, কিন্তু তাহাদের ছাত্রেরা যে আবাসিক কেম্‌ব্রিজ বা অক্সফোর্ডের ছাত্রদের তুলনায় কোনো বিষয়ে কম অগ্রসর সেকথা তো বলা যায় না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিতে যাইবার আগে কথাটা আর একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। মনে হয় এদেশে ছোট বড় নানা আকারের নানা ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন ; তাহাদের কতকগুলি হইবে আবাসিক, কতকগুলি অনাবাসিক। কতকগুলিতে হয়তো পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষা কেন্দ্রীভূত করা হইবে ; কতকগুলি আবার শুধু পরীক্ষা লইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে। তাহাদের অধীনে ও নেতৃত্বে ছোট ছোট কলেজগুলিতে

লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকিবে (সে ব্যবস্থা আবাসিক অনাবাসিক দুই ভাবেরই হইতে পারে) এবং কলেজে গ্রন্থাগার, পরীক্ষাশালা ইত্যাদির উন্নততর ব্যবস্থা করিয়া এবং শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপনের সুযোগ দিয়া শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধন করা হইবে। এতবড় একটা প্রকাণ্ড দেশে ছড়ানো ছোট ছোট অনেক কলেজ থাকিতে বাধ্য ; তাহাদের প্রত্যেকটিকে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা অসম্ভব। সুতরাং তাহাদের একত্র করিয়া অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

কিন্তু কলেজগুলির কোনো উন্নতি সাধন করিতে গেলে প্রথমেই অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে এদেশের উচ্চশিক্ষার তাহাই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা

যুদ্ধ শেষ হইতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আর একবার ভারতবর্ষের শাসনপদ্ধতির সংস্কারের কথা উঠিল এবং ১৯২১ সালে মণ্টেগু-চেমসফোর্ডের পরিকল্পিত সংস্কার প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দ্বৈতশাসন শুরু হয়। এই শাসনসংস্কার প্রবর্তন উপলক্ষে দেশে মতভেদ দেখা গেল। দেশের অধিকাংশ নেতাই তাহার বিরুদ্ধে গেলেন। মাত্র কয়েকজন এই সংস্কারব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইলেন ; তাঁহারা নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিলেন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। এইভাবে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারব্যবস্থার ফলে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত দেশী মন্ত্রী, ও গভর্নরকর্তৃক নিযুক্ত একজিকিউটিভ কাউন্সিলার এই দুইয়ে মিলিয়া দেশশাসনের ভার লইলেন। ব্যবস্থাপক সভাগুলি আইন করার ব্যাপারে

অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ করিল এবং মন্ত্রীগণও কিছু পরিমাণ ক্ষমতা হাতে পাইলেন। অবশ্য আর্থিক ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতাই রহিল গভর্নর ও তাঁহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের হাতে।

তখন যুদ্ধের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে; কয়েক বৎসর দুঃখকষ্ট ভোগ করার পর দেশে আবার শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থের অনটনও কিছুটা কমিয়াছে। সুতরাং তখন আদর্শকে বাস্তবরূপ দান করিবার জন্য চারি দিকে একটা উৎসাহ দেখা গেল। যুদ্ধের সময় সাম্য স্বাধীনতা গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি কয়েকটা আদর্শের কথা বড় করিয়া শোনা গিয়াছিল। যুদ্ধশেষে ইহাদের কয়েকটাকে আংশিকভাবেও বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা হইল।

নবনির্বাচিত মন্ত্রীগণ নূতন আদর্শে দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় প্রথমেই শিক্ষাসংস্কারের কাজ হাতে লইলেন। শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম কথা প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার। সুতরাং নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রথম একটা কাজ হইল প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইন তৈয়ারি করা। প্রাথমিক শিক্ষার বিল উপস্থিত করা হইল এবং আইন পাস হইয়া গেল। নবনির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভাগুলি এইভাবেই গোখলের পরাজয়ের প্রত্যুত্তর দিল।

১৯২০ হইতে ১৯৩০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই প্রাথমিকশিক্ষা সম্বন্ধে আইন করা হয়। আমাদের বাংলাদেশে প্রথম আইন করা হইল ১৯২০ সালে; সে আইনে শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইল। ১৯২১ সালে যখন গ্রামগুলিকে লইয়া ইউনিয়ন বোর্ডগুলি গঠিত হয় তখন সেগুলিতেও যাহাতে বিশ সালের আইন প্রয়োগ করা যায় তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ঠিকমত আইন হইতে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

অবশেষে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়।

নূতন আইনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য শিক্ষা-কর ধার্য করার ব্যবস্থা হইল। টাকায় ছয় পাই শিক্ষা-কর। উপরন্তু সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থাও থাকিল; বাংলা-সরকার প্রতি বৎসর শিক্ষা-কর হইতে যাহা আয় হইবে তাহার উপর আরও ২৩ লক্ষ টাকা দিবেন।

তখন হইতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য নূতন ধরণের এক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক বোর্ড গঠিত হইয়াছে; তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে জেলা স্কুল বোর্ড। এতদিন জেলাবোর্ডের উপরই প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল; এখন তাহার জায়গায় জেলা স্কুল বোর্ডকে সে ভার দেওয়া হইল। জেলা স্কুল বোর্ড শিক্ষা-করের টাকা পাইবে, সরকারী সাহায্যের অংশ পাইবে এবং এই টাকায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকের শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা, এ-সকল ব্যাপারই জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে থাকিবে। জেলা স্কুল বোর্ড গঠনের পর প্রথম দুইবার অর্থাৎ প্রথম আট বৎসর তাহার সভাপতি হইবেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট; পরে সভ্যগণ তাঁহাদের সভাপতি নির্বাচন করিবেন। আপাতত এইভাবে জেলা স্কুল বোর্ডগুলি আধাসরকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাদের উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে।

আগেকার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ছিল মোট পাঁচ বৎসরের। নূতন আইনে পাঠ্যক্রমের প্রসার কমাইয়া চার বৎসরের করা হইল এবং তাহার জন্য নূতন পাঠ্যক্রম তৈয়ারি করা হইল। তাহাতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থাও হইল। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বহু জেলায় স্কুল বোর্ড গঠিত হইল; কয়েকটা জেলাতে শিক্ষা-করও

বসিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তৈয়ারি করিবার জন্যও ব্যবস্থা করা হইল। মনে হইল বুঝি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা এইবারে মিটিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, এত আয়োজন ও আইন সত্ত্বেও কার্যত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বিশেষ কিছুই হইতেছে না। ইতিমধ্যেই নূতন ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে চার বৎসরে তাহা ভাল করিয়া শেষ করা যায় না, তাহার জন্য অন্তত পাঁচ বৎসর চাই। জেলা স্কুল বোর্ডগুলিও ঠিকমত কাজ করিতেছে না। বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও স্থানীয় রাজনীতি বোর্ডের কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। সাম্প্রদায়িক অনুপাতে শিক্ষক রাখিতে হইবে, এদিকে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক পাওয়া গেল না, সুতরাং অযোগ্য লোককেই লইতে হইল; এমন ব্যাপার বহু স্থানে ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। এইভাবে একদিকে যেমন শক্তি ও সুযোগের অপচয় ঘটিতেছে, অন্যদিকে তেমনই অর্থের অভাব বাড়িয়া চলিয়াছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করিতে গেলে কত খরচ হইবে ১৯২২ সালে তাহার একটা হিসাব করা হয়। তাহাতে দেখা যায় শুধু বাংলাদেশেই এই বাবদ দুই কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

শিক্ষা-কর সর্বত্র বসাইলে ও কর আদায় হইলে এবং সরকারী সাহায্য ঠিকমত পাইলে হয়তো এই খরচের খানিকটা উঠিতে পারে। কিন্তু এই বাংলাদেশেই এখনও সকল জেলাতে জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হয় নাই; শিক্ষা-করও সর্বত্র বসানো হয় নাই এবং কবে যে বসানো হইবে তাহাও বোঝা যাইতেছে না। কারণ আইন করিতে করিতে এদিকে দেশের অবস্থা ১৯২১ সালের তুলনায় অনেকটা খারাপ হইয়াছে, উৎসাহও

মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। এইজন্যই ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রয়োগ করা সম্ভবপর হইতেছে না। ফলে আইন হইয়াছে বটে কিন্তু আইন ঠিকমত চালানো যাইতেছে না।

একটা উদাহরণ দিলেই অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা যাইবে। শহরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আইন বাংলাদেশে প্রথম হয় ১৯২০ সালে, অথচ তাহার পর এই চব্বিশ বৎসরের মধ্যে (১৯৪৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্প একটু অংশ, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়া বাংলা-দেশের অন্য কোনো শহরে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিকভাবে প্রবর্তন করা হয় নাই। বস্তুত সারা ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত মাত্র ১৯৪টি শহরে ও চৌদ্দ হাজার গ্রামে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহাও শহরগুলিতে যে সর্বত্র পুরাপুরি আবশ্যিক করা হইয়াছে তাহা নহে। সারা কলিকাতার দুইটি মাত্র পাড়ায় এবং বোম্বাই শহরে দুইটি পল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা হইয়াছে; শহরে অন্যান্য অংশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আগেকার মতই আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে আইনগুলি হইয়াছে তাহাদের দাবি অন্য দেশের তুলনায় বেশি নহে। অন্য দেশে যেখানে আট বৎসর আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে আমাদের দেশের আইনে সে জায়গায় মাত্র চার বৎসর অর্থাৎ ছয় হইতে দশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের আবশ্যিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ঠিক যে বয়সটাতেই সব চেয়ে শিক্ষার দরকার সেই বয়সটাতেই আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেষ করিয়া বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসে।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার সকলের চোখে পড়িয়াছে; আমাদের পাঠশালায় বেশির ভাগ ছাত্রই প্রথম শ্রেণীতেই তাহাদের লেখাপড়া শেষ

করে, তাহার বেশি আর অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় না। যদি এক-শ জন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভরতি হয় তবে তাহাদের মধ্যে মাত্র কুড়ি জন শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে অর্থাৎ পুরা চার বৎসর লেখাপড়া শেখে। ইহার ফলে শতকরা আশিজনের জন্য যে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় হয় তাহা কোনো কাজেই আসে না। সেটা হয় শুধু পণ্ডশ্রম।

এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে কয়েকটি কারণে। তাহাদের মধ্যে প্রথম, দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য ; ছেলে রাখালি করিয়া বৎসরে এক টাকা বেতন পাইলেও সেটা সংসারের পক্ষে প্রকাণ্ড লাভ ; সুতরাং পাঠশালায় যাওয়ার চেয়ে রাখালি করার আকর্ষণ বেশি। অন্যদেশে সরকার পরিবারকে সাহায্য করে, বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখায়, বিনামূল্যে বইপত্র দেয় ; আমাদের তো সে ব্যবস্থা নাই।

দ্বিতীয় কারণ, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা। অন্যদেশের তুলনায় এ ব্যবস্থা নেহাতই নীরস, নিরানন্দ। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য এমন মনোরঞ্জক এবং তাহার শিক্ষাব্যবস্থা এমন চিত্তাকর্ষক নহে যাহার ফলে ছেলে রাখালি করার চেয়ে পাঠশালায় যাওয়া বেশি পছন্দ করিবে। সে শিক্ষায় কাহারও মন ভরে না, না শিক্ষকের, না ছাত্রের।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকলের চেয়ে বড় সমস্যার উল্লেখ করা উচিত। সে সমস্যা শিক্ষকের সমস্যা ; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যদি নিজে শিক্ষিত না হন, তিনি যদি মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে চিত্তাকর্ষক ভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা না দিতে পারেন তাহা হইলে সে শিক্ষায় কোনো উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে, শিক্ষকের ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাঁহাকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে এবং পাঠশালাগুলির

আবহাওয়া বদলাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু অন্য সব দূরে থাক প্রাথমিক পাঠশালার গুরুমহাশয়দের আমরা যে বেতন দিই তাহাতে কোনো লোকই সে কাজ স্বেচ্ছায় লইতে পারে না। একটা আদালতের পেয়াদাও গুরুমহাশয়ের চেয়ে বেশি বেতন পান; অত কম বেতনে শহরে একটা ভালো চাকরও পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় গুরুমহাশয়দের কাছ হইতে বেশি কিছু আশা করা কঠিন। এই সকল কারণেই পূর্বের তুলনায় আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা বাড়িলেও দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে না। ১৯৪১ সালের লোকসংখ্যা হইতে দেখিতে পাই, এদেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা এখনও শতকরা দশের বেশি হয় নাই।

এই সমস্যার একমাত্র যুক্তিসংগত সমাধান, আবশ্যিক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন। কিন্তু তাহার প্রধান বাধা অর্থের অভাব। সে অভাব আজও ঘুচিল না। যখন দ্বৈতশাসনের আমলে আর্থিক সমস্ত ক্ষমতাই গভর্নর ও তাঁহার একজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের হাতে ছিল তখন নাহয় মন্ত্রীগণ বলিতে পারিতেন রাজস্বের ভার তাঁহাদের হাতে নাই, সুতরাং তাঁহারা খরচ জোগাইতে পারেন না; কিন্তু আজ তো রাজস্বের ভার প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতেই আসিয়াছে; কিন্তু দেখা যাইতেছে তাঁহারাও এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। তথাকথিত স্বাধীন মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব হারাইবার ভয়ে শিক্ষা-কর বাড়ানো দূরে থাক্ ঠিকমত বসাতেই সাহস পাইতেছেন না। তাঁহারা দেশের লোককে সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না, টাকা চাই, টাকা না থাকিলে লেখাপড়া হয় না, ভালো শিক্ষা দিতে গেলে ভালো করিয়া খরচ করিতে হয়। সুতরাং আজও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম; এখনও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যার কোনো সমাধানই হইল না।

অবশ্য দোষটা পুরাপুরি মন্ত্রীদের উপর দেওয়া চলে না ; কারণ ত্রুটি তাঁহাদের নহে, ত্রুটি আমাদের শাসনব্যবস্থার। ১৯৩৫ সালের ব্যবস্থায় ১৯২১ সালেরই মতো বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে নূতন আকারে। এখন রাজস্ব বাড়াইবার সকল উপায়গুলি গিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, আর খরচ বাড়াইবার সকল চাপ পড়িয়াছে প্রাদেশিক সরকারের উপর। সাধারণত আয়কর, কাস্টমস শুল্ক ইত্যাদিই আয় বাড়াইবার পথ ; তাহাদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রাদেশিক সরকারের নহে, ভারত-সরকারের ; এমন-কি, যে পাট বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি তাহার মুনাফাও ভারত-সরকারের। এ অবস্থায় হয় ভারত-সরকারকে প্রাদেশিক গবর্মেণ্টগুলিকে উপযুক্তমত অর্থ সাহায্য করিতে হইবে, নতুবা প্রাদেশিক সরকারকে রাজস্ব ঠিকমত বাড়াইবার উপায় করিয়া দিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা না করিলে কোনোদিনই শিক্ষার সংস্কার করা যাইবে না। গবর্মেণ্ট আজও উপযুক্ত পরিমাণ টাকা দিতে পারেন নাই বলিয়াই এদেশে আজও প্রাথমিক দূরে থাক্ কোনোপ্রকার শিক্ষার সংস্কারই সম্ভবপর হয় নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড পরিকল্পিত শাসনসংস্কার প্রবর্তন করার ব্যাপারে দেশে মতভেদ উপস্থিত হয় এবং এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ কল্পে ১৯২০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন বহু ছাত্রছাত্রী সরকারী ও সরকারসম্পর্কিত বিদ্যালয় ছাড়িয়া আসে। তাহাদের শিক্ষার জন্য আবার একবার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দেখা দেয় ; তখন আর একবার কথা ওঠে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই আন্দোলনের ফলে ১৯২১ সালে আবার বহু জাতীয় বিদ্যালয়

গঠিত হইল ; জাতীয় মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইল ; কলিকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন স্থাপিত হইল। পাটনায়, কাশীতে, গুজরাটে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইল ; এমন-কি আলিগড়ে (এখন ইহা দিল্লির নিকট সরাইয়া আনা হইয়াছে) জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া অর্থাৎ জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। ছাত্রের দল সেগুলিতে যোগ দিল। কিন্তু স্বদেশী যুগেরই মত এবারও কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বন্ধপ্রায় হইয়া আসিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎসাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এইজন্যই তাহার সাহায্যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টি করা কঠিন। তাহার উপর আবার বাহিরের প্রতিকূলতার সহিত অহরহ লড়াই করিয়া নূতন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় ; সে কাজ সহজ নহে, বিশেষ করিয়া যখন বাহিরে দীর্ঘদিনের একটা ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে, যে ব্যবস্থা তাহার দীর্ঘজীবনের ভার ও অধিকার লইয়া আপন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে।

সেদিনকার এই জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কয়েকটি এখনও কোনোমতে টিঁকিয়া আছে। কিন্তু সেগুলির দ্বারা দেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ কোনো উপকার হয় নাই। এবারকার জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। যে-অঞ্চলে বেশির ভাগ লোক সরকারের উপর নির্ভর করে, সে-অঞ্চলের তুলনায় যে-অঞ্চলে লোকে ব্যবসায় ইত্যাদি বেশি করে সেখানে জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ভালো ও বেশিদিন চলিয়াছিল। সরকারী চাকরি করিতে গেলে সরকারী ছাপ চাই। এইজন্যই সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার পাশে তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সরকারী সম্পর্করহিত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার টিঁকিয়া থাকা কঠিন। আমাদের দেশের শিক্ষার ইতিহাসে কয়েকবারই এই কথার সত্যতা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটা দাবি ছিল মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। এককালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া আর সর্বত্রই ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন ইংরেজী, কিন্তু গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য এখনও সর্বত্র মাতৃভাষার অধিকার কার্যত ও পুরাপুরিভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই; কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতি আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইদানীন্তন কালে ইহাকেই সব চেয়ে বড় সংস্কার বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের অন্য নানা চেষ্টাও দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা যে বড় বেশি পুঁথিঘেঁষা, এ অভিযোগ অনেকদিনের। এই অভিযোগ দূর করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে ব্যাবহারিক অর্থাৎ হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টাও মাঝে মাঝে করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের সংস্কার করিয়াছেন; অন্যত্রও এই ধরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। মাদ্রাজে হাইস্কুলগুলিতে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ রাইটিং, বুক-কিপিং শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইদানীং এদিকে দেশের লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় একটি কারণে। আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে বেকার-সমস্যা যে দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের এদেশের জাতীয় জীবনে এ সমস্যার গুরুত্ব অনেকখানি। সরকারও ইহার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা দেশের অনেক রাজনৈতিক গোলমালের মূলে রহিয়াছে এই শিক্ষিতের বেকার-

সমস্যা। অতএব সকলেই একমত হইয়া সমস্যার সমাধান খুঁজিতেছেন এবং একস্বরে শিক্ষাব্যবস্থাকে ইহার জন্য দায়ী করিতেছেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা একটিমাত্র খাত বাহিয়া চলে, ইহার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ব-বিদ্যালয়, অথচ অনেকেই সেখানে যাইবে না বা অনেকের সেখানে যাইবার যোগ্যতা নাই। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার আয়োজন থাকা উচিত; সেখানে ব্যাবহারিক ও হাতেকলমের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিলে তাহারা সে শিক্ষা তাহাদের জীবনে প্রয়োগ করিতে পারে; সুতরাং বর্তমান বৈচিত্র্যহীন মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের আয়োজন করিতে হইবে, সেখানে যন্ত্র (টেকনিকাল), কৃষি, ব্যবসায়ী (কমার্শিয়াল), শিল্প ইত্যাদি নানাধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, আবার সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হইবে; ছাত্রেরা আপন আপন অভিপ্রায়, রুচি ও জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী যাহার যে ভাবের প্রয়োজন সেই ভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা করিতে পারিলে একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা সার্থক হইবে, অন্যদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাও বহু ব্যর্থতার হাতহইতে মুক্তি পাইবে; তখন সেখানে যাহাদের যে শিক্ষা লাভের যোগ্যতা ও অবসর আছে শুধু তাহারাই যাইবে। আজ যেমন সকলকেই বাধ্য হইয়া সেখানে যাইতে হয় তেমন আর হইবে না। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইবে। এই ধরণের কথা আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে।

কথাটা যখন উঠিয়াছে তখন এইখানেই বলা ভালো। দেখা গিয়াছে যখনই আমাদের জাতীয় জীবনে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে তখনই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেই এই ত্রুটির জন্য দায়ী করা হয়; অপবাদ গিয়া পড়ে তাহারই উপর। আমাদের শিক্ষাই যেন সকল অন্যায়ের মূল। বাহ্যত মনেও হয় তাই; বুঝি শিক্ষার সংস্কার করিলে ত্রুটিগুলি আপনা হইতেই দূর

হইবে, এবং সকল দুঃখের অবসান ঘটিবে। কিন্তু ব্যাপার তো সেরূপ নহে। শিক্ষার ক্ষমতা অনেকখানি এ কথা ঠিক; কিন্তু এই শিক্ষাই পদে পদে অন্য বহু শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে; বস্তুত তাহারাই শিক্ষাকে পরিচালিত করিতেছে। এই শক্তিগুলির মধ্যে রাজনীতিই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিই শিক্ষাকে প্রতিপদে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার কার্যকারিতা কমায় বাড়ায়, তাহার রূপান্তর সাধন করে। তাই রাজনীতিকে বাদ দিয়া শিক্ষার আলোচনা করিলে সে আলোচনা অবাস্তব হইয়া উঠে। যেমন দেখা যাক বেকার-সমস্যা ও মাধ্যমিক শিক্ষার কথা। ধরিয়াই লওয়া যাক যে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া আমরা সেখানে যন্ত্র, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি ইত্যাদি নানা ধরণের শিক্ষার আয়োজন করিলাম, ছেলেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়া এই ধরণের শিক্ষা লাভ করিল। তাহা হইলেই কি আপনা হইতেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে? তাহা হইলেই অমনি কি ছেলেদের কাজ জুটিয়া যাইবে? না, তাহা হয় না। কারণ আদতে সমস্যাটা বেকার-সমস্যা নহে, বে-পেশা-সমস্যা। কাজের নহে, দেশে নানা রকমের পেশারই অভাব ঘটিয়াছে। পেশা নির্ভর করে জাতির অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপর। দেশে ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসার না হইলে যন্ত্রশিক্ষাই বলুন, ব্যবসায়শিক্ষাই বলুন সকল প্রকার শিক্ষাই ব্যর্থ। এদিকে এদেশে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার মুখ্যত রাজনীতির সমস্যা, অর্থনীতির নহে। সুতরাং আমরা বিদ্যালয়ে যন্ত্রশিক্ষা দিলাম আর দেশের সর্বত্র নানারকমের যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিল, এমন হয় না। দেশে যন্ত্রশিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নাই অথচ বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার প্রমাণ আমরা রাশিয়ায় পাইয়াছি। অতএব এভাবের যুক্তি না তোলাই ভালো। তবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভালো দেখায় না, সুতরাং শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টাই না হয় করা যাক।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই ধরণের শিক্ষা সংস্কারের কথা উঠিল। যুক্তপ্রদেশের গবর্মেণ্ট স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে বেকার-সমস্যা আলোচনার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। সেই সপ্রু-কমিটি প্রস্তাব করেন, শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের হেরফের করিয়া মাধ্যমিক স্তরে নানা ধরণের ব্যাবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখনকার দুইটি ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথমটি ইস্কুলের সঙ্গে জুড়িয়া ইস্কুলের পাঠ্য এগারো বৎসরের করিতে হইবে এবং শেষেরটি বি.এ,র সহিত জুড়িয়া দিয়া বি.এ পরীক্ষার পাঠ্য তিন বৎসরের করিয়া দিতে হইবে। ইণ্টারমিডিয়েট বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। ইস্কুলের এগারো বৎসরের দুইটা বড় ভাগ হইবে প্রাথমিক পাঁচ বৎসর ও মাধ্যমিক ছয় বৎসর। মাধ্যমিক ছয় বৎসরে আবার দুইটা ভাগ থাকিবে, নিম্ন-মাধ্যমিক তিন বৎসর ও উচ্চ-মাধ্যমিক তিন বৎসর। এই শেষ তিন বৎসর সাধারণ ছাড়া কৃষি, শিল্প যন্ত্র, ব্যবসায় ইত্যাদি নানাভাবের শিক্ষার আয়োজন করা হইবে। মোটামুটি ব্যবস্থাটা কতকটা এই ভাবের।

ভারত-সরকারের শিক্ষা বিষয়ে যে কেন্দ্রীয় পরামর্শ-সমিতি আছে তাহাতেও এই ধরণের প্রস্তাব করা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য যে ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ড আছে তাহাও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কিন্তু এ পর্যন্ত এই প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা-সংস্কারের বিশেষ কোনো চেষ্টা হয় নাই। বাংলাদেশে তো এখন বাদবিতণ্ডা চলিয়াছে কে মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহাই লইয়া। তবে সম্প্রতি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আংশিকভাবে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে। সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল (উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) নামে এক নূতন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে। সেখানে আমাদের হিসাবে

এগারো বৎসর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। দিল্লিতে এখন হইতে কলেজগুলি তিন বৎসর পড়াইয়া বি.এ. ডিগ্রি দিবে।

আর এক নূতন পরীক্ষা দিল্লিতে করা হইতেছে। সেখানে পলিটেকনিক নামে এক নূতন ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। সেখানে সাধারণ ও ব্যাবহারিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলিয়াছে। পলিটেকনিকের আদর্শ এদেশে নূতন নহে; আমাদের বাংলাদেশেই পলিটেকনিক নামধেয় বিদ্যালয় আছে, সেখানে কিছু পরিমাণ যন্ত্রশিক্ষার আয়োজনও হয়তো আছে, কিন্তু সেগুলি নেহাত গৌণভাবে। সেখানে সাধারণ শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে।

পুরাতন যুগ গেল, আমরা আজ নূতন এক যুগে আসিলাম; তাহার বিশেষত্ব যন্ত্রের ব্যবহার। এই যন্ত্রযুগে যে নূতন সমন্বয়ের প্রয়োজন আমাদের বিদ্যালয়ে তাহার আয়োজন কোথায়, এই প্রশ্নই আজ উঠিয়াছে। যন্ত্রহীন পুরাতন যুগে আমরা ফিরিতে পারিব না, ফিরিব না; অথচ নূতন এই যন্ত্রযুগে যদি নূতনভাবে জীবন গড়িয়া না তুলিতে পারি তবে যে-যন্ত্র মানুষের দাস হইবার কথা তাহাই আমাদের প্রভু হইয়া উঠিবে এবং মানুষের সৃষ্টির কাছে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও পরাজয় ঘটিবে। বর্তমান যুগের ইহাই সকলের চেয়ে বড় সমস্যা।

এ সমস্যার সমাধান শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে মুখ্যত নহে, ইহার সমাধান করিতে হইবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে। সেখানে নূতন আদর্শে নূতন প্রেরণা লইয়া নূতন ভাবে চলিতে হইবে; শুধু এখানে একটু ওখানে একটু এইভাবে হেরফের করিয়া শিক্ষাসংস্কারের চেষ্টা করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না; তাহার প্রকৃতিগত পরিবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সেরূপ কোনো পরিবর্তনের চেষ্টা আমাদের দেশে আজও করা হয় নাই।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতি

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেও মৌলিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করা সকলের আগে দরকার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষার প্রকৃতি বদলাইতে হইবে; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের ও পাঠনারীতির পরিবর্তন করিতে হইবে; বিদ্যালয়গুলির মৌলিক রূপান্তর সাধন না করিতে পারিলে, শিক্ষার ভিত্তি নূতনভাবে গড়িয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন নূতনভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী শিক্ষাসংস্কারের এক নূতন পরিকল্পনা রচনা করেন এবং ১৯৩৮ সালে তাঁহার অনুপ্রেরণায় বুনিয়াদি শিক্ষার (basic education) পরিকল্পনা রচিত হয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে; সুতরাং ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনায় সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সাত বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। সাত বৎসরের কমে কোনোমতে হয়তো লেখা ও পড়া শেখানো অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞান দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত করা চলে না। বিশেষ করিয়া কতকগুলি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় আছে যেগুলি খুব ছোট বয়সে শেখানো যায় না।

আরও একটি কারণে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। ইহার কিছু আগেই বয়ঃসন্ধিকাল গিয়াছে; সেটা জীবনের খুব সঙ্গীন সময়; সেই সময়টাতে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে রাখিতে পারিলে অনেক লাভ হয়। সাধারণ ব্যবস্থায়

দশ-এগারো বৎসর বয়সেই আবশ্যিক শিক্ষা শেষ করা হয় ; এই যে কারণ উল্লেখ করিলাম তাহার জন্যই বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত।

বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনায় পাঠ্যক্রমেরও প্রকৃতিগত কিছু হেরফের করা হইয়াছে। তাহাতে নানারকমের হাতে-কলমে কাজের এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে ইংরেজীর স্থান নাই, তাহার পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার সব চেয়ে বড় কথা, মাতৃভাষাকে আগাগোড়া শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার। গান্ধীজী মনে করেন মাতৃভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার করিয়া এবং শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিয়া আমরা সাত বৎসরে যে জ্ঞান ছাত্রদের দিতে পারিব, তাহা বর্তমানে ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া যাহা শেখে তাহার তুলনায় কম হইবে না, বরং কোনো কোনো বিষয়ে হয়তো বেশিই হইবে।

বুনিয়াদি শিক্ষা-দর্শনের গোড়াকার কথা, জীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতির পরিবর্তে সহযোগিতানীতির প্রবর্তন এবং সহযোগের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমরা হিংসা ও হানাহানিকেই জীবনের মুখ্য প্রেরণা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। মানুষে মানুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে, এ উহাকে পরাজয় করিয়া জয়ের ফলভোগ করিবে, যে পরাজিত হইবে সে পিছনে পড়িয়া থাকিবে, এই ব্যবস্থাকেই আমরা স্বাভাবিক মনে করিয়াছি এবং জীবনসংগ্রাম, যোগ্যতমের উদ্বর্তন এই বৈজ্ঞানিক মতবাদকে অভ্রান্ত ভাবিয়া প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। এই নীতির ভিত্তিতে যে সমাজ গড়িয়া ওঠে স্বভাবতই তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ মারামারি হানাহানি চলে ; আমাদের সমাজেও তাই হইয়াছে। এ কথা সত্য পৃথিবীতে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটে ; কিন্তু তাহাই একমাত্র সত্য নহে ; প্রাণীজগতে শুধু ভোগ বা সংগ্রামই একমাত্র নীতি

নহে, সেখানে ত্যাগ ও সহযোগিতা-নীতির লীলাও পাশাপাশি চলিতেছে ; মানুষে মানুষে মিলিয়া সমাজ গড়িতেছে, একে অপরের জন্য ত্যাগ করিতেছে, আত্মবিসর্জন করিতেছে। সুতরাং যদি জীবনে এই সহযোগিতার নীতিকে আমরা বড় করিয়া দেখিতে পারি, যদি ছেলে-মেয়েদের মনে এই নীতির অনুপ্রেরণা দিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো এমন এক সমাজ একদিন গড়িয়া উঠিবে যেখানে মানুষ পরের সহিত মিলিয়া চলাকে, পরের জন্য ত্যাগ করাকেই জীবনের চরম শ্রেয় বলিয়া মনে করিবে। তখন মানুষ অপরকে হিংসা না করিয়া ভালবাসিবে ; এবং সেদিন আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ প্রেমের ভিত্তিতে রচিত হইবে।

এই যে নূতন আদর্শের কথা বলিতেছি জীবনের প্রথম হইতেই ছেলেমেয়েদের সেই শিক্ষা দিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই সেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। সেইখানেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে এই সহযোগিতার আদর্শের বীজ বপন করিতে হইবে, ছোটবেলা হইতেই কাজে ও কথায় তাহাদের শিখাইতে হইবে সকলকে লইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়াই জীবনে চলিত হয় এবং তাহাই জীবনের লক্ষ্য।

কর্ম ও চিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে মিলন হইতে পারে ; কিন্তু মনোবিকাশের একটা স্তরে কর্মের ক্ষেত্রে মিলন সহজ ও প্রশস্ত। সুতরাং বিদ্যালয়-সমাজে একত্রে কর্ম করিবার সুযোগ দিতে হইবে। সেখানে ছাত্রছাত্রীগণ একত্রে কাজ করিবে, একত্রে খেলাধুলা আনন্দ-উৎসব করিবে। সেখানে কর্মকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা চলিবে, শুধু পুঁথিকে আশ্রয় করিয়াই নহে। বস্তুত যে শিক্ষা আমরা অহরহ জীবনে প্রয়োগ করি তাহার বেশির ভাগ আমরা পাই কাজের ভিতর দিয়াই, পুঁথির ভিতর দিয়া নহে। যে বিদ্যা আমরা হাতেকলমে শিখি সেই

বিদ্যাই আমাদের জীবনে সব চেয়ে কার্যকরী হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ে হাতেকলমে কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার একটি বিশেষত্ব তাহাতে কোনো একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার আয়োজন করা হইয়াছে। যেমন ধরা যাক চরকা ও তাঁতশিল্প, কৃষি বা কাঠের কাজ ; ইহাদের মধ্যে যেটিকে নির্বাচন করা হইবে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্য সব শিক্ষা চলিবে। যদি চরকা ও তাঁতকে কেন্দ্রীয় শিল্পরূপে নির্বাচন করা যায় তাহা হইলে সেখানে প্রথম হইতেই ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগ সময় চরকার কাজ শিখিবার জন্য দিবে এবং প্রধানত সেই উপলক্ষ্য করিয়াই সাহিত্য ভূগোল ইতিহাস অঙ্ক ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করিবে। এইভাবে যে অনেক কিছু শেখানো যায় তাহা পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য যেটুকু এই উপায়ে শেখানো যাইবে না তাহার জন্য সাধারণভাবে পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু মোটের উপর শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইবে।

এ কথা হয়তো কেহ ভাবিতে পারেন, পুরাতন ব্যবস্থার সহিত একটা যে-কোনো বৃত্তিমূলক শিক্ষা জুড়িয়া দিলেই তো এইরূপ হইবে। বস্তুত কিন্তু তাহা নহে। পুরাতন ব্যবস্থায় শিল্পকে কেন্দ্রে স্থান দেওয়া হয় নাই ; সেখানে পুঁথির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ; সেখানে পুঁথিই মুখ্য এবং হাতের কাজ গৌণ স্থান পাইয়াছে।

এ কথা উঠিতে পারে যে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা বৃত্তিশিক্ষার রূপান্তর মাত্র ; কিন্তু তাহা সত্য নহে ; সকলকে তাঁতি বা ছুতোর করা ইহার লক্ষ্য নহে ; কারণ দেশে তাঁতি ও ছুতোরের অভাব নাই। তাহাদেরই অন্ন জোটে না, তাহার উপর আরও তাঁতি ছুতোর তৈয়ারি করিলে পূর্বতনদের দুঃখও বাড়িবে, যাহারা নূতন শিখিবে তাহাদেরও অন্ন জুটিবে না।

এ কথা সত্য যে গান্ধীজী আশা করিয়াছিলেন যে এই ভাবে হাতের কাজ শিখাইয়া যে অর্থ উপার্জন হইবে তাহা হইতে বিদ্যালয়ের খরচ অনেকটা উঠিতে পারে। যে-দেশে অর্থের অভাবে শিক্ষার প্রসার হয় না সে-দেশে যদি কেহ বিদ্যালয়গুলিকে স্বাবলম্বী করিতে বলেন তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু নানাকারণে স্বাবলম্বনের এই আদর্শ শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নহে। বস্তুত বুনিয়াদি শিক্ষার পূর্ণ পরিকল্পনায় হাতের কাজের ব্যাপারে স্বাবলম্বনের উপর মোটেই জোর দেওয়া হয় নাই। অনেকেই সে কথা জানেন না বলিয়া তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে আজও ভুল ধারণা রহিয়া গিয়াছে।

হাতের কাজের একটা বিশেষ উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন ; কারণ এই জন্যই বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় ইহাকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

মনোবিদ্যায় বলে, মন ও ইন্দ্রিয়গুলির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ এবং আমরা শুধু মন দিয়াই শিখি না, সব ইন্দ্রিয় দিয়া শিখি। আঙুলগুলি নিপুণ-ভাবে পরিচালনা করিতে শিখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধির নৈপুণ্য লাভ হয়, মনের বিকাশ ঘটে। সুতরাং পুঁথিই বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার একমাত্র উপায় নহে, অন্য উপায়ও আছে। এবং সে উপায়গুলিকে যত বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা যায়, বুদ্ধির বিকাশও তত বেশী হয়। সেইজন্যই বিদ্যালয়ে হাতের কাজের এবং নানারকম শিল্পশিক্ষার প্রয়োজন, শুধু বৃত্তি শিখাইবার জন্য নহে, মানসিক ভাব ও বৃত্তিগুলির অনুশীলনের জন্য।

তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। মুখে আমরা যাহাই বলি-না কেন আমরা পুঁথিকে বড় ও হাতের কাজকে ছোট করিয়া দেখি। পুঁথির কৌলীন্যের বিচারে আমাদের সমাজকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করিয়াছি। যাহারা পুঁথি ও নিছক বুদ্ধির চর্চা করে, সেই বুদ্ধিজীবীরা একভাগে, আর

এক ভাগে যাহারা শ্রমজীবী, যাহারা হাতের কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এ কথা আজ জোর করিয়া বলা দরকার হইয়াছে যে সমাজদেহের এই ভাগ সামাজিক ঐক্যের পরিপন্থী ; ইহা দূর করিতে না পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। সেইজন্যই জাতীয় জীবনের সর্বত্র এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় এই অন্যায় ভেদের প্রতিকার সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ব্যবস্থায় আমরা যদি প্রথম হইতেই হাতের কাজকে তাহার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারি, যদি ছোটবেলা হইতেই ছেলে-মেয়েদের শিখাইতে পারি যে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সম্মানের কোনো প্রভেদ নাই, সমাজে উভয়েরই প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে হয়তো আজ সমাজে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে যে অন্যায় প্রভেদ আমরা করিয়াছি তাহা অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং উভয়ে উভয়কে বুঝিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথির বোঝা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে ; সে বোঝার চাপে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনা করার ক্ষমতা পিষ্ট ও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হয়তো বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের ভিতরে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনতার ও সৃষ্টি করিবার আনন্দের কিছু পরিমাণ আস্বাদ লাভ করিবে। মানুষের সহজাত ভাব, বৃত্তি ও শক্তিগুলির মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তি অন্যতম। সকল মানুষই অল্পবিস্তর পরিমাণে এই শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং নানাভাবে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকের এই শক্তি বিকাশের পথ ও উপায় স্বতন্ত্র। সকলেই যে একই ভাবে একই রকমে সৃষ্টি করে এমন নহে। কেহ ছবি আঁকে, কেহ গান গায়, কেহ বা নূতন নূতন আবিষ্কারের নেশায় বিভোর হইয়া চলে; কেহ আবার এই শক্তিরই প্রেরণায় নূতন ভাবে মানুষ বা সমাজ গড়িবার কাজে নিজেকে উৎসর্গ

করে। ক্ষুদ্রতম শিশু হইতে প্রতিভাশালী শিল্পী বা কবি পর্যন্ত সকলেই আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিতেছে এবং আপন আপন শক্তি ও সুযোগ অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করিতেছে। ইহাই জীবনের ধর্ম। ইহাকেই আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলি। জীবন এই বিকাশের সাধনা। এই বিকাশের সুযোগ পাইলে জীবনে আনন্দ ভরিয়া ওঠে। সে আনন্দ চারিদিকে উৎসারিত হইয়া ব্যক্তি ও সমাজকে ধন্য করে। আত্ম-প্রকাশের এই পথ অবরুদ্ধ হইলে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বাধা ঘটে। শুধু তাহাই নহে, অবরুদ্ধ পুঞ্জীভূত ভাবগুলি সহজভাবে প্রকাশের পথ না পাইয়া মনোজগতে নানা বিপ্লবের স্থষ্টি করে এবং ফলে জীবনে অতৃপ্তি ও দুঃখতাপ ঘনীভূত হইয়া ওঠে। কিন্তু শুধু ব্যক্তির জীবনেই ইহার শেষ নহে, ইহার ফল শেষ পর্যন্ত সমাজদেহে সংক্রামিত হয় এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত মানবাত্মা সমাজকে হিংসাদ্বন্দ্বের পথে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই জন্যই মানুষ যে স্থষ্টি করিবার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহার স্বাধীন প্রকাশে তাহার সকলের চেয়ে বড় তৃপ্তি ও আনন্দ, বিদ্যালয়-ব্যবস্থায় সেই শক্তি বিকাশের নানারূপ সুযোগ দিতে হইবে। নানারকম হাতের কাজের মধ্যে সেই শক্তির আত্মপ্রকাশের সুন্দর সুযোগ আছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের অধিকতর সুযোগ আছে বলিয়াই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা সকলের সমর্থন করা উচিত।

এই নূতন পরিকল্পনা লইয়া দেশে নানারূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে, একদল ইহার পক্ষে গিয়াছেন এবং আর একদল বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি এই পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি প্রায় পুরাপুরিই সমর্থন করিয়াছেন। যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন তখন কয়েকটি প্রদেশে

এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করা হয়। বোম্বাইয়ে বিহারে যুক্তপ্রদেশে এবং উড়িষ্যায় বহু বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, শিক্ষকদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করা হয় এবং সকলেই পরম উৎসাহে এই পরীক্ষায় যোগ দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া দিবার পর এই উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া যায়। তখন যাঁহারা দেশ-শাসনের ভার লন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের এই পরিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং বহু স্থানেই পরীক্ষা বন্ধ হইয়া যায় এবং পুরাতন ব্যবস্থা নূতন করিয়া শুরু হয়। ইহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? নূতনভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার মত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এখনও আমাদের শাসনকর্তাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; গবেষণাগারে দীর্ঘদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া অবশেষে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য প্রয়োগ করিবার মত ধৈর্য বিশ্বাস ও শক্তির আমাদের মধ্যে বড় অভাব। এইজন্যই আকস্মিক উৎসাহ ছাড়া শিক্ষা-সংস্কারের অন্য কোনো প্রেরণা আমাদের দেশে সম্ভব হয় না। তাই মনে হয়, যদি কোনোদিন জাতীয় জীবনে বিপ্লবের ফলে বা অন্য কোনো কারণে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় তবেই হয়তো এদেশে শিক্ষাসংস্কার সম্ভব হইবে, নতুবা নহে।

আমাদের সমস্যা

আমাদের দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে বড় সমস্যা কি, যদি কেহ এই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর চান তাহা হইলে বলিব, এদেশে এখনও জাতীয় শিক্ষার পত্তন হয় নাই। জাতীয় শিক্ষার প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম লক্ষণ, এই ব্যবস্থায় দেশের সর্বশ্রেণীর সর্বলোকের প্রয়োজনমত শিক্ষার আয়োজন থাকে। শুধু একটা বিশেষ বয়সের বা বিশেষ ধরণের শিক্ষার

ব্যবস্থা থাকিলেই তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না। প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি রুচি ও প্রয়োজন ভিন্ন, সেই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তাই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যন্ত্র শিল্প কলা ইত্যাদি সকল প্রকার শিক্ষার, এবং বয়সভেদে শিশুশিক্ষা হইতে বয়স্কশিক্ষা পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার আয়োজন থাকে। যে-দেশে শতকরা দশজন লোকও অক্ষরজ্ঞান লাভ করে নাই সে-দেশে যে জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। অন্য দেশে যখন দুই-তিন বৎসরের শিশুরা নার্সারি বিদ্যালয়ে খেলা করিয়া নাচিয়া গান গাহিয়া শিক্ষার ও জীবনের বুনিয়াদ রচনা করিতেছে, যখন শ্রমিকেরা দিনের শেষে বিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া নিজের ও সমাজের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে শিখিতেছে, যখন সেখানে আবশ্যিক বিদ্যাশিক্ষার বয়স বাড়াইয়া ষোল বৎসর করার ব্যবস্থা হইতেছে তখন আমরা ছয় হইতে দশ বৎসর এই চার বৎসরের ছেলেদের শিক্ষাও আবশ্যিক করিতে পারিতেছি না, দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে পারিতেছি না, দেশের বয়স্কদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব, আমাদের জাতীয়-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে? ইদানীং মেয়েদের শিক্ষার প্রতি কিছু পরিমাণ দৃষ্টি গিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও এদেশে শতকরা চারজন মেয়েও লেখাপড়া জানে না। এ অবস্থায় জাতীয়-শিক্ষার কথা না বলাই বোধ হয় ভাল।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বড় সমস্যার সমাধান এখনও আমরা করি নাই; তাহাদের কোন্ ধরণের শিক্ষা দিব, কি ভাবে লেখাপড়া শিখাইব, এ প্রশ্নের এখনও ঠিকমত উত্তর দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা অন্ধভাবে আমাদের বিদেশী গুরুর অনুসরণ করিতেছি। অনুসরণ করা অবশ্য দূষণীয় নহে, যদি তাহা অন্ধ না হয়। আমাদের সমাজ-

ব্যবস্থায় মেয়েদের যে স্থান আমরা দিয়াছি বা দিব তাহাদের শিক্ষা তাহার অনুযায়ী হওয়া চাই। কিন্তু এই আদর্শের সহিত আমাদের ব্যবহারের বিশেষ মিল নাই। মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শিখাইতেছি বটে, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত নহে, নেহাতই ফ্যাশনের খাতিরে বা কয়েকটা ব্যাপারে সুবিধা পাইবার জন্য। বস্তুত আমরা ছেলেদের শিক্ষাও যেমন জ্ঞানের জন্য নহে, অর্থলাভের জন্যই দিই, মেয়েদেরও তেমনি সুবিধারই জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাই। জ্ঞানের প্রতি আমাদের লোভ নাই, শ্রদ্ধাও নাই; তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পদে পদে এত ব্যর্থতা জমিয়া উঠিয়াছে।

সারা জীবন ধরিয়াই শিক্ষা চলে এবং বিদ্যালয়ের অঙ্গন ছাড়াইলেও জ্ঞান আহরণ শেষ হয় না, এ কথা এককালে এদেশের লোকে জানিত। তাহারা এ কথাও জানিত যে, লেখাপড়া শিখিলেই শিক্ষা শেষ হয় না; তাই তখন এদেশে লোকশিক্ষার জন্য যাত্রা কথকতা প্রভৃতি নানাপ্রকারের অনুষ্ঠান ছিল এবং সেগুলি সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ ছিল। লোকশিক্ষার এই পুরাতন ব্যবস্থা নষ্টপ্রায় হইয়াছে অথচ তাহার স্থানে অন্য কোনো নূতন ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। এই জন্যই বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থার এত প্রয়োজন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেশের অতি অল্প লোকেরই জন্য; দেশের বেশির ভাগ লোক শিক্ষার সে স্তরে গিয়া পৌঁছিবে না। তাহাদের জন্য প্রথম ও শেষ স্তরের শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থার দরকার। সমাজের উন্নতি নির্ভর করিবে মুখ্যত ইহাদেরই উপর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক উচ্চশিক্ষিত হইলেও দেশের বাকি লোকে যদি অজ্ঞানের অন্ধকারে দিন কাটায় সে-দেশকে কেহ উন্নত ও শিক্ষিত বলিবে না।

এককালে লেখাপড়া না জানিলেও শিক্ষিত হওয়া যাইত; কিন্তু বর্তমান যুগ পুঁথির যুগ; এ যুগে তাই পুঁথির জ্ঞান দরকার। তাই বয়স্কশিক্ষার

প্রথম ধাপ লেখাপড়া ; কিন্তু তাহাই শেষ ধাপ নহে। বস্তুত লেখাপড়া শিখিলে তখন শিক্ষা শুরু হয় ; বয়স্কশিক্ষার লক্ষ্য শুধু লেখাপড়া নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। লেখাপড়া সাধনমাত্র, সাধ্য নহে। আমাদের জাতীয়-শিক্ষাব্যবস্থায় সেই শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে।

এতক্ষণ জাতীয়-শিক্ষার বিস্তারের কথাই বলিয়াছি। এইবার জাতীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ, ইহার প্রকৃতির কথা সংক্ষেপে বলিব। তাহার পূর্বে ভারত-সরকারের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শদাতা মিঃ সার্জেণ্ট সম্প্রতি যুদ্ধোত্তরকালের জন্য এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।[১] ইহা লইয়া এদেশে নানাপ্রকার আলোচনা চলিতেছে।

এই প্রসঙ্গেই আরও দুইটি পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি করিয়াছিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভারও সেই কমিটির উপর ছিল। সার্ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে একটি শাখা-সমিতি সেই মতে একটি বিস্তারিত শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ; দুর্ভাগ্যক্রমে সে পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। নিখিল-ভারতীয় শিক্ষাসম্মেলনের কর্তৃপক্ষও একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন তবে তাহা সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার মত বিস্তারিত নহে।

সার্জেণ্টের পরিকল্পনায় জাতির সকল স্তরের জন্য শিক্ষার আয়োজন করিবার কথা বলা হইয়াছে। তাহার আরম্ভ আট বৎসর ব্যাপী আবশ্যিক

১ পরিকল্পনাটি বাস্তবিক পক্ষে সার্জেণ্টের নিজের তৈয়ারি নহে। গত কয়েক বৎসরে কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা সমিতির বিভিন্ন কমিটিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সেইগুলি একত্র করিয়া এবং শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া সার্জেণ্ট এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরামর্শদাতা না থাকিলে এই পরিকল্পনার জন্ম হইত কি না সন্দেহ।

প্রাথমিক শিক্ষায় (সে শিক্ষার প্রকৃতি অনেকটা মৌল শিক্ষার প্রকৃতির অনুরূপ) এবং পরিণতি বয়স্কশিক্ষাব্যবস্থায়। তাহাতে নানারকমের মাধ্যমিক শিক্ষা, নূতন ধরণের তিন বৎসরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্র ব্যবসায় কৃষি শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে ; উপরন্তু শিশুশিক্ষা, ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও অবসরবিনোদন, অল্পবয়স্ক শ্রমশিল্পীদের কাজের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সময় শিক্ষাদান, শিক্ষকের শিক্ষা ও বেতন ইত্যাদি প্রশ্নেরও আলোচনা আছে। ইহাতে ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার কথা বলা হইয়াছে। শিক্ষারম্ভের পাঁচ বৎসর পরে ছাত্রদের বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠান হইবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় নানা শ্রেণীর হইবে ; কোথাও নানারকমের যন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, কোথাও সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত পড়িবে। বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে সেইখানেই লেখাপড়া শেষ করিবে। অল্প যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিবে তাহারা আরও তিন-চার বৎসর শিক্ষালাভ করিবে। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে আমাদের শুধু যে আরও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় চাই তাহা নহে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্যও আরও অনেক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। তাহাদের সংখ্যাও বাড়াইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে নূতন ধরণের শিক্ষায়তন স্থাপন করিতে হইবে। এই সরকারী পরিকল্পনাতেই এই প্রথম শিশুদের (অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের) জন্য নার্সারি ইস্কুলের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত এত ব্যাপকভাবে এদেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা ইতিপূর্বে আর কখনও করা হয় নাই, আর এরূপ সর্বাঙ্গপূর্ণ পরিকল্পনাও আমরা ইতিপূর্বে পাই নাই। কিন্তু এ পরিকল্পনা মুখ্যত

শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে, এক মাতৃভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন করা ছাড়া শিক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে ইহাতে অন্য বিশেষ কোনো আলোচনা নাই।

সার্জেণ্টের মতে শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে এদেশে শিক্ষার সংস্কার সম্ভব নয়। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের আরও বেশি বেতন দিতে হইবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতন কিরূপ হওয়া উচিত তাহার বিস্তারিত নির্দেশ তিনি দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশ টাকা হওয়া দরকার। তাহার কমে উপযুক্ত লোকে এ কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিবে না।

সমগ্র দেশে আট বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কত শিক্ষক দরকার তাহার হিসাব করিয়াছেন। সে হিসাবে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই প্রায় দুইশত কোটি টাকার দরকার হইবে। আর এতগুলি শিক্ষক একদিনেই তৈয়ারি করা যাইবে না, ধীরে ধীরে করিতে হইবে। সেইজন্যই সার্জেণ্ট চল্লিশ বৎসরের পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন; ইহার প্রথম পাঁচ বৎসর যাইবে আয়োজন করিতে; ততদিনে একদল শিক্ষক তৈয়ারি হইবে। তাহাদের লইয়া কাজ শুরু করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর প্রতি বৎসর যেমন যেমন শিক্ষক তৈয়ারি হইবে তেমন তেমন অগ্রসর হইতে হইবে। চল্লিশ বৎসরের শেষে যখন শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে তখন সমগ্র ব্যবস্থার জন্য বৎসরে তিনশত কোটি টাকা লাগিবে।[১] সার্জেণ্টের হিসাবে বাংলাদেশে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে বৎসরে সাতান্ন কোটি টাকা লাগিবে। ইহার মধ্যে চল্লিশ কোটি যাইবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য; এই চল্লিশ কোটি টাকার মধ্যে

[১] এই হিসাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরা হয় নাই; লোকসংখ্যা বাড়িলে, আর চল্লিশ বৎসরে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই বাড়িবে, খরচও বাড়িবে।

আটাশ কোটি টাকা যাইবে শিক্ষকদের বেতন বাবদ। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখা ভালো যে, সারা বাংলাদেশে এখন আমরা প্রতিবৎসর অনুমান তিনকোটি টাকা শিক্ষা বাবদ ব্যয় করিয়া থাকি।

হঠাৎ মনে হয় বুঝি তিনশত কোটি টাকা চাহিয়া আমরা অসম্ভবের দাবি করিতেছি। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না ভারতবর্ষে প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের বাস। তাহাদের শিক্ষার জন্য তিনশত কোটি এমন কিছু বেশী নহে ; তাহাতে মাথা পিছু দশটাকার কমই পড়িবে। একটা তুলনা দিলেই অবস্থাটা পরিষ্কার বোঝা যাইবে। ইংলণ্ডে আজ সেদেশের সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে শিক্ষার জন্য মাথাপিছু পঞ্চাশ শিলিং খরচ করা হয়। আর সার্জেণ্ট-পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিলে আজ হইতে চল্লিশ বৎসর পরে আমরা এদেশে মাথা পিছু দশটাকারও কম খরচ করিব অর্থাৎ ইংলণ্ড আজ যাহা খরচ করে তাহার তিন ভাগের এক ভাগেরও কম খরচ করিব। সুতরাং কেমন করিয়া বলিব তিনশত কোটি টাকা চাওয়া অসম্ভব দাবি করা ?

অনেকে ভাবেন অর্থের অভাবে প্রথমে নাহয় চার বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক, পরে অর্থ জুটিলে এক-এক বৎসর করিয়া বাড়াইলেই চলিবে। চার বৎসরে শিক্ষার ভিত্তি স্থায়ীভাবে গড়া যায় না, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই সে শিক্ষা ব্যর্থই হয়।[১] স্থায়ী শিক্ষা দিতে হইলে অন্তত আট বৎসর দরকার। সেইজন্য সার্জেণ্টের পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে টাকা না থাকিলে সারা দেশে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন না

১ চার বৎসরের শিক্ষার কথা প্রথম বলেন স্যর ফিলিপ হার্টগ। তাঁহার মতে চার বৎসর পাঠশালায় পড়াইলেই অক্ষরজ্ঞান স্থায়ী হয়। এই মতের সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে কিনা জানা যায় না ; কিন্তু এই ধারণা দেশে চলিত হইয়া গিয়াছে। বোধ করি আমাদের অর্থের অভাবই ইহার মূলে আছে।

করিয়া দেশের মাত্র একটা অংশেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে ; টাকা জুটিলে বাকি অংশের কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

সম্প্রতি বরোদায় কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির অধিবেশনে সার্জেণ্টের পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং সমিতি মোটামুটিভাবে সমগ্র পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহাদের প্রস্তাব ভারত-সরকারের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমিতির বিবেচনাধীন। এ কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে যুদ্ধোত্তরকালে এদেশে শিক্ষাসংস্কারের ধারা মোটামুটি-ভাবে সার্জেণ্টের পরিকল্পনা অনুযায়ীই হইবে। বরোদার অধিবেশনে মূল পরিকল্পনার দুই-একটি প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে, যেমন নার্সারি স্কুলের ছাত্রদের বয়স তিন হইতে ছয় করা হইয়াছে এবং আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে ছয় হইতে তেরো বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য। মূল পরিকল্পনায় সাত হইতে চৌদ্দ পর্যন্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা আবশ্যিক করার প্রস্তাব ছিল।

কিন্তু সমস্যা এই যে, এত টাকা আসিবে কোথা হইতে ? আমরা এখন সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় তেত্রিশ কোটি টাকা খরচ করি ; সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরাপুরি কাজ করিতে হইলে অন্তত তিনশত কোটি টাকার দরকার হইবে। অবশ্য প্রথমেই যে এত টাকা পুরা লাগিবে তাহা নহে ; তাহার অনেক কম টাকা লইয়াই আরম্ভ করা যাইতে পারে ; কিন্তু সে টাকার পরিমাণও কম নহে। তাহার জন্য প্রতিবৎসর প্রায় ষাট কোটি টাকা লাগিবে।

এত টাকা আমরা কোথায় পাইব ? ইহার উত্তরে সার্জেণ্ট বলিয়াছেন, যুদ্ধের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে পারিলে অর্থের অভাব হয় না। যদি আমরা সত্যসত্য মনে প্রাণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি তাহা হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইবে কি না ভবিষ্যৎই শুধু বলিতে পারে। এই বাংলাদেশেই যুদ্ধের জন্য নূতন নূতন পথ বিমানঘাঁটি প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে যে খরচ হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা দিয়া এই প্রদেশের ছেলেমেয়েদের কত বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারিত তাহার হিসাব কে করিবে?

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটা মোটামুটি ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বাকিটুকু ভরিয়া দেওয়া হয় নাই। কোনো আদর্শে, কিভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইবে অর্থাৎ এক কথায় আমাদের জাতীয়-শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ হইবে পরিকল্পনায় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা নাই। অথচ তাহারই উপর জাতীয়-শিক্ষার স্বরূপ নির্ভর করে। এইজন্যই সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই যে প্রকৃতির কথা বলিতেছি ইহাই জাতীয়-শিক্ষার দ্বিতীয় লক্ষণ।

জাতীয়-শিক্ষার প্রকৃতি জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। জাতীয়-শিক্ষা জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপোষক, জাতীয় সংস্কৃতি তাহার প্রধান বাহন এবং জাতীয় জীবনের আদর্শ তাহার মুখ্য উপজীব্য। মাতৃভাষা, জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করিয়া যে শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হয় তাহাকে জাতীয় বলিতে পারি না। আজও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আজও এই ব্যবস্থায় আমরা ইতিহাসের নামে স্বজাতির মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী পাঠ করিতেছি, বিদেশীকে অযথা বড় করিয়া দেখিতে শিখিতেছি, তবু কি ইহাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলিব? মিথ্যা ইতিহাস, ভ্রান্ত অর্থনীতি, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় স্থান পাইতে পারে না। যে শিক্ষা জাতির কল্যাণে নিয়োজিত নহে, যে-শিক্ষা দেশকে ভালোবাসিতে শিখায় না সে-শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলিব না। কিন্তু দেশের

প্রতি অন্ধ ভক্তি শিখানোই জাতীয় শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নহে; জাতীয় আদর্শকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করাই তাহার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য। তাহার লক্ষ্য ভবিষ্যতের উপর নিবদ্ধ, শুধু অতীতকে লইয়াই তাহার দিন চলে না। আমরা যাহা হইতে চাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যদি তাহা না শিখায়, যদি সে-শিক্ষার ফলে আমাদের জাতীয় আদর্শকে মূর্ত করিয়া তুলিবার সুবিধা না হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহাকে জাতীয় শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিব? জাতির সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন যে ব্যবস্থা মিটাইতে না পারে তাহাকে জাতীয় ব্যবস্থা বলা যায় না।

প্রশ্ন উঠিবে, ভারতের জাতীয় আদর্শ কি? এই লইয়া মতভেদ ঘটিবে, কিন্তু সে মতভেদ প্রধানত ছোটখাটো ব্যাপারে, জাতীয় আদর্শের মোটামুটি রূপ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে, এবং সে-বিষয়ে মতের অনৈক্য বিশেষ নাই। আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাই। সে স্বাধীনতা সকলের স্বাধীনতা, দলবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের নহে। আমরা ঘরের বা বাহিরের কোনো প্রকারের শোষণই চাহি না, আমরা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন সাম্যের ভিত্তির উপর গড়িতে চাই, আমরা প্রত্যেকেই জীবনকে ভোগে ও সেবায় সার্থক করিয়া তুলিবার সুযোগ ও সুবিধা চাই— এই কথাগুলি বোধ করি রাজনৈতিক মত-নির্বিশেষে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইবেন। এইটুকু ঐক্যের ভিত্তিতেই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তাহাতে এখানে ওখানে হয়তো কিছু পরিমাণ মতভেদের অবকাশ থাকিবে; কিন্তু উপায় নাই। সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা ছাড়া, জাতীয় আদর্শ প্রাণবান; ইহার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে; আজ আমরা যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছি কাল হয়তো সে লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া আরও

দূরের কোনো লক্ষ্যকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিব ; আমাদের জাতীয় আদর্শের এইভাবে ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর ঘটিবে ; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার আদর্শের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়া চলিতে থাকিবে। সুতরাং ইহা লইয়া চুলচেরা তর্ক বা মারামারি করা নিষ্ফল।

এই প্রসঙ্গেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কথা তুলি। এই লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে ; ধর্মের অভাবে বর্তমান শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হইতেছে, ঈশ্বরহীন শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে উচ্ছন্নের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ধর্মভীরু লোকে এই ধরণের নানা রকম অভিযোগ করিতেছেন ! তাঁহাদের মতে ধর্মকে বাদ দিয়া শিক্ষা দেওয়া চলে না, মানুষের মনকে শুধু শিক্ষা দেওয়া যায় না— সমগ্র মানুষকে শিক্ষা দিতে হয় এবং তাহা হইলেই বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার আয়োজন করিতে হয়।

কথাটি ঠিকই, সমগ্র মানুষকেই শিক্ষা দিতে হইবে ; কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে, কোন্ ধর্ম শিক্ষা দিব, এবং সে শিক্ষা কেমন করিয়া ও কোথায় দিব ? তাহার চেয়েও বড় কথা, ধর্ম কি অঙ্ক ও ভূগোলের মত শেখানো যায় ? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে গোড়ায় একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার। ধর্ম একান্তই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার ; মানুষ ও তাহার বিধাতাকে লইয়া তাহার কারবার। তাহার মধ্যে অন্য কোনো মানুষকে বা সমাজকে টানিয়া আনা শুধু অশোভন নয়, অন্যায়ও বটে। যেখানে এবং যখনই ধর্মকে রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে সেইখানেই অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে ; ধর্মের নামে অধর্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে। সেইখানেই ধর্মকে ছুতা করিয়া অত্যাচার-অবিচার করা হইয়াছে। স্পেনের ইনকুইজিশনের কথা অনেকে মনে করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এইরকম আরও কত ইনকুইজিশন অন্যত্র হইয়াছে তাহার সন্ধান কে দিবে ?

এই জন্যই ধর্মের ভার রাষ্ট্রের উপর দিতে নাই, ধর্ম ও সমাজকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হয়। বস্তুত রাষ্ট্রের বা সমাজের তো কোনো ধর্ম নাই; তাহারা ধর্মাধর্মের অতীত। সুতরাং যাহা রাষ্ট্রের বা সমাজের সকলের সেবার ও ভোগের জন্য সেখানে ধর্মকে টানিয়া আনিলে চলিবে না, আনিলেই বিরোধ বাধিবে। রাষ্ট্রের অর্থে যে বিদ্যালয় চলিতেছে তাহা রাষ্ট্রের সকলের, সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের লোকের সাধারণ সম্পত্তি। সেখানে ধর্ম শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে তখন কোন্ ধর্ম শিখাইব, কতখানি শিখাইব তাহাই লইয়া মারামারি বাধিবে। যদি সকলের ধর্মই শিখাইতে হয় আর প্রত্যেক ধর্মের সব কিছু শিখাইতে হয় তাহা হইলে সব সময়টুকুই তাহার জন্য দিতে হইবে, বিদ্যালয়ে অন্য কিছু শিখাইবার আর সময় থাকিবে না।

কথা উঠিবে, সকল ধর্মের মধ্যেই খানিকটা মিল আছে, সেইটুকুই না-হয় শেখানো যাক। প্রত্যেক ধর্মের দুইটি অংশ আছে, একটি তাহার অন্তর্নিহিত জীবনদর্শন, আর-একটি তাহার বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান। এ কথা সত্য যে দর্শনের ভূমিকায় বিভিন্ন ধর্মমতের একটা সামঞ্জস্যের সন্ধান মেলে; কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের কি সে দর্শন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে? তাহাদের আমরা কয়েকটা শ্লোক মুখস্থ করাইয়া দিতে পারি, কয়েকটা বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান শিখাইতে পারি বটে কিন্তু যেখানে বিভিন্ন ধর্মগুলির মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় ছেলেমেয়েদের মনকে সেখানে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। অকালে অসময়ে সে চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়েরা ভাসাভাসাভাবে বড় বড় কথা বলিতে শেখে বটে কিন্তু তাহাতে তাহাদের বা সমাজের কাহারও কোনো কল্যাণ হয় না। তাহাকে ধর্মশিক্ষা বলিব না। আর যে আচার-অনুষ্ঠান ছেলেমেয়েদের সহজেই শেখানো যায় সেইগুলি লইয়াই তো যত গোল, সেইখানেই তো ধর্মে ধর্মে বিরোধ বিদ্বেষ জাগে, মতের মিল

হয় না। সুতরাং সেগুলি শিখাইয়া লাভ কি? তাহাতে পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা দূরে থাক বিরোধের সম্ভাবনাই বাড়িবে। অতএব যখন ধর্মশিক্ষা দিবার বাধা এত, যখন ধর্মশিক্ষা দেওয়ায় লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনা বেশি তখন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

বস্তুত ধর্ম তো শিক্ষণীয় বিষয় নহে, ইহা যে উপলব্ধির ব্যাপার। বৃক্ষ যেমন সংগোপনে আকাশ আলোক হইতে জীবনরস সংগ্রহ করে আমরা তেমনি বিশ্বে বাস করিয়া বিশ্ববিধাতার স্পর্শ অর্থাৎ ধর্ম উপলব্ধি করি। জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন মনের পূর্ণবিকাশ হয় নাই তখন সে উপলব্ধি প্রধানত আসে দেখিয়া, শুনিয়া নহে। ধর্মের আবহাওয়ায় বাস করিয়া এবং ধর্মময় জীবনের স্পর্শে আসিয়া আমরা ধার্মিক হই, ধর্মের কথা শুনিয়া নহে। ধর্মের কথা শুনিয়া ধার্মিক হওয়ার সময় আসে অনেক পরে; সে অবস্থায় আসিবার আগে ধর্মকথা শুনাইতে গেলে মনে বিরূপতা জাগিতে পারে, ধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগের সৃষ্টি হইতে পারে। এইজন্যই ছোটবেলায় সাক্ষাৎভাবে ধর্মশিক্ষা দিতে নাই। তাহাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তবে কি ধর্মকে জীবন হইতে একেবারে বাদ দিব? না, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা না দিলেই যে ধর্মকে জীবন হইতে বাদ দেওয়া হইল এমন তো নহে। বিদ্যালয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনের কতটুকু সময় কাটে? বস্তুত বিদ্যালয়ই তো আমাদের একমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্র নহে; আমরা আরও অনেক স্থান হইতে নানাভাবে অহরহ শিক্ষালাভ করিতেছি এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার তুলনায় সে শিক্ষার মূল্য কম নহে। উদাহরণস্বরূপ পারিবারিক জীবনের উল্লেখ করি; পরিবারে বাস করা, পারিবারিক জীবনে সহযোগিতা করা যে কতখানি শিক্ষাপ্রদ তাহা সকল সময়ে আমরা বুঝি না। সেখানে পিতামাতা

আত্মীয়বন্ধুর স্নেহস্পর্শে আমাদের অলক্ষ্যে যে-শিক্ষা আমরা প্রতিদিন লাভ করিতেছি তাহার প্রভাব বিদ্যালয়ে লব্ধ শিক্ষার প্রভাবের চেয়ে বেশি বই কম নহে।

আমার কথা, যদি ধর্মশিক্ষা দিতে হয় তবে পরিবারেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অন্যত্র কোথাও নহে। গৃহ এবং পরিবারই তো ধর্মশিক্ষা দিবার প্রশস্ততম অনুকূলতম ক্ষেত্র; সেখানে পিতামাতার জীবনাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের স্নেহস্পর্শে সন্তান যেভাবে দীক্ষা লাভ করিবে তাহার চেয়ে ভালো ভাবে আর কোথায় সে শিক্ষা লাভ করিতে পারে?

বস্তুত এককালে তো সাধারণ পাঠশালায় আজ যেভাবে আমরা ধর্ম-শিক্ষা দিতে চাহিতেছি সেভাবের ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত না। তখন যে লোকে ধর্মকে কম শ্রদ্ধা করিত এমন নহে; কিন্তু তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এমন সুসংবদ্ধ ও সংহত ছিল যে সেখানে বাস করিয়াই ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই ধর্মবিষয়ে শিক্ষা লাভ করিত। সুতরাং তখন পাঠশালায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কোনো তাগিদ ছিল না।

আজ যখন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার কথা শুনি তখন মনে হয় বিদ্যালয়কে বড় বেশি অধিকার আমরা দিতেছি; বিদ্যালয়কে এত ভার দেওয়া বিদ্যালয়ের পক্ষেও কল্যাণকর নহে, আমাদের পক্ষেও কল্যাণকর নহে। নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া বিদ্যালয়ের উপর সে দায়িত্ব চাপাইয়া দিলে সাময়িক সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে শেষ পর্যন্ত পরিবারের ও সমাজের সমূহ ক্ষতিই হইবে। সেইজন্যই আমি বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করি।

জাতীয় শিক্ষার তৃতীয় লক্ষণ, শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের ভার থাকিবে জাতির প্রতিনিধিগণের উপর থাকে। জাতীয় আদর্শ অনুযায়ী সে

ব্যবস্থার পরিবর্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহাদের থাকিলে তবেই সে ব্যবস্থাকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করা যায়, নতুবা নহে।

যে লোক আমার ভাষা জানে না, আমার ঐতিহ্যের সহিত যাহার পরিচয় নাই, আমার সংস্কৃতিকে যে শ্রদ্ধা করে না, আমার জাতীয় আদর্শের প্রতি যাহার সহানুভূতি নাই সে যত ভাল লোকই হউক না কেন, যত সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হউক না কেন, তাহার পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা হইতে পারে না। এ কথা বলিতেছি না যে তাহার সহায়তা আমরা চাই না; তাহার সাহায্যের, পরামর্শের, শুভেচ্ছার আমাদের বড় প্রয়োজন, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার পরিচালনার ভার তাহার হাতে ছাড়িয়া দিতে পারি না। ইহাতে অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধার কোনো কথা নাই; তাহার পক্ষে যে ভার গ্রহণ করা সম্ভব নহে সে ভার তাহাকে দেওয়া তাহার উপর অবিচার করা; এই অন্যায় হইতে তাহাকেও মুক্তি দিতে হইবে আমাকেও মুক্তি পাইতে হইবে। ইহাই জাতীয় শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি।

স্বাধীন মানুষ গড়িতে হইলে স্বাধীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদেশে আজও সেই স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার পত্তন হয় নাই; কি করিয়া হইবে তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা।

উপসংহার

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইতিহাসের নবপর্যায় শুরু হইল। জাতীয় জীবন গঠনের যে বড় অন্তরায় স্বাধীনতার অভাব, সে অভাব আজ দূর হইয়াছে; স্বাধীন জাতীয় শিক্ষার পত্তন এখন সম্ভব হইয়াছে। আমাদের জাতীয় সরকারও নানাভাবে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অংশে নূতন করিয়া

গড়িবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রাচীন ভারতবর্ষের পল্লীপ্রধান ও কৃষিপ্রধান সভ্যতাকে রূপান্তরিত করিয়া কতকটা শিল্পপ্রধান আধুনিক সভ্যতায় পরিণত করার কাজ এখন চারিদিকে দ্রুতগতিতে চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও নানারকম পরিবর্তন ঘটিতেছে; প্রাথমিক মাধ্যমিক যান্ত্রিক ও উচ্চশিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই নূতন নূতন প্রয়াস চলিয়াছে। কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার নানারূপ পরিকল্পনা লইয়া কর্মে অগ্রসর হইতেছেন। তাহাদের কথা বলিতে গেলে একখানা নূতন গ্রন্থ লিখিতে হয়; সংক্ষেপে তাহাদের কথা বলাও সম্ভব নয়। সুতরাং সে চেষ্টা আর করিলাম না।

এখন আর উৎসাহের ও সুযোগের কোনো অভাব নাই, কিন্তু অন্তরায় হইয়াছে সমস্যার বিপুলতায়, আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে। ফলে নানা দিকে নানারূপ ত্রুটি দেখা দিতেছে। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা যাইতেছে। ইদানীং কালের জনসংখ্যাবৃদ্ধিও সমস্যাগুলিকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিচেষ্টা মাত্রেই যাহা অবশ্যম্ভাবী সেই বিরোধিতা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু তাহাতে ভয় পাইবার কোনো কারণ নাই; স্বাধীন দেশ মাত্রেই এ ধরণের বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া চলিতে হয়।

এখন আমাদের বড় সমস্যা হইল কেমন করিয়া আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের ষোল আনা নকল না করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সুরটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে আগামী দিনে ইহাই আমাদের মুখ্য সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানে সাময়িক চটকে ভুলিলে চলিবে না, বা রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান

হইবে না। ইহার জন্য ভারতসরকারের ও সর্বসাধারণের অক্লান্ত চেষ্টা ও সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন। তাহা হইলে একদিন-না-একদিন আমাদের আদর্শ রূপপরিগ্রহ করিবে। স্বাধীন দেশ মাত্রেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থারও রূপান্তরণ হয়, আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিবে।

—

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস। ২১১ কর্ন্‌ওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

২'১

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বপরিচয়	১·৮০
ইতিহাস	২·৫০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণতত্ত্ব	২·৩০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বাংলা সাহিত্যের কথা	১·৫০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির পরাজয়	১·৫০

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দুসমাজের গড়ন	২·৫০

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভারতদর্শনসার	৩·৩০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাস	২·০০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২·৩০

সুরেন ঠাকুর

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২·৩০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

হিউএনচাঙ	২·৫০, বোর্ড ৩·০০

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পূজাপার্বণ	৩·০০, বোর্ড ৪·০০

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বাংলার নব্যসংস্কৃতি	১·৪০